একাত্তরের
চিঠি

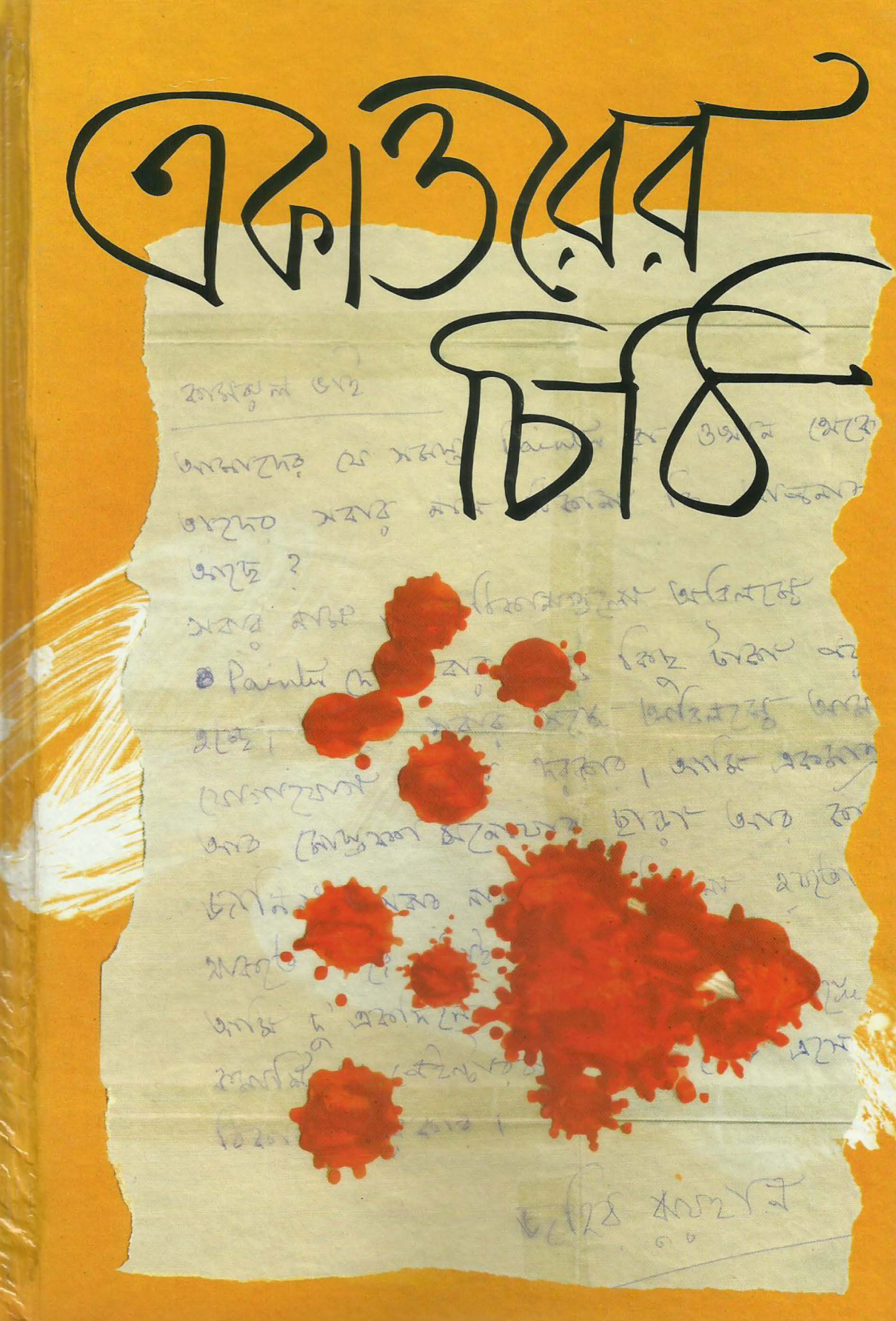

একাত্তরের চিঠি

মুক্তিযুদ্ধ ই আর্কাইভ
liberationwarbangladesh.org

প্রথম আলো | গ্রামীণফোন
উদ্যোগ

একাত্তরের চিঠি

সম্পাদনা পরিষদ

সভাপতি
সালাহউদ্দীন আহমদ

সদস্য
আমিন আহম্মেদ চৌধুরী
রশীদ হায়দার
সেলিনা হোসেন
নাসির উদ্দীন ইউসুফ

প্রথমা

প্রথমা

মিডিয়াস্টার লিমিটেড-এর প্রকাশনা উদ্যোগ
প্রথমা প্রকাশন কর্তৃক বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত

একাত্তরের চিঠি
গ্রন্থস্বত্ব © প্রকাশক

প্রথম সংস্করণ : চৈত্র ১৪১৫, মার্চ ২০০৯
দ্বিতীয় সংস্করণ : বৈশাখ ১৪১৬, মে ২০০৯

প্রকাশক
মতিউর রহমান
প্রথমা প্রকাশন
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ

বিক্রয়কেন্দ্র
প্রথমা
৪৩-৪৪ আজিজ কো-অপারেটিভ সুপার মার্কেট
শাহবাগ, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী

অলংকরণ অশোক কর্মকার

মূল্য : দুই শত পঞ্চাশ টাকা

মুদ্রণ : কমলা প্রিন্টার্স
৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা ১০০০

Ekattorer Chithi
(Letters of 1971 from participating
freedom fighters in the liberation
war of Bangladesh)

Published by
Prothoma Prokashan
(Publishing initiative of Mediastar Ltd.)
CA Bhaban, 100 Kazi Nazrul Islam Avenue
Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh

Price: Taka Two Hundred Fifty

ISBN 978 984 8765 00 5

● **সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত**
এই প্রকাশনা অন্য কোনো ধরনের বাঁধাই ও প্রচ্ছদে বাজারজাত করা অথবা বিধিসম্মত না হলে এই প্রকাশনার কোনো অংশ প্রথমা প্রকাশনের লিখিত অনুমতি ছাড়া কোনোভাবে পুনঃপ্রকাশ বা ব্যবহার করা এবং ফটোকপি, রেকর্ড অথবা অন্য কোনো তথ্য সংরক্ষণ পদ্ধতিতে, যান্ত্রিক অথবা বৈদ্যুতিক মাধ্যমে অনুলিপি করা যাবে না

বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ পাঠাগার ও গবেষণা কেন্দ্র
Bangladesh Liberation War Library & Research Centre
মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস হোক উন্মুক্ত

সবিনয় নিবেদন

এত গৌরবময়, এত বেদনাময় বছর বাঙালির জীবনে আগে কখনো আসেনি। বছরটি ১৯৭১। এই একটি বছরের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্ব বাংলাদেশকে জানল, চিনল এবং বুঝতে পারল সবুজ শ্যামল প্রকৃতির কাদামাটির মতো নরম বাঙালি প্রয়োজনে কতটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে। কোনো সন্দেহ নেই বাঙালি বর্ষাকালে যেমন কোমল, গ্রীষ্মে তেমনই রুক্ষ ও কঠিন।

কে ভাবতে পেরেছিল 'ভেতো বাঙালি' নামে অভিহিত, 'কাপুরুষ' পরিচয়ে পরিচিত বাঙালি জাতি পাকিস্তান নামের অবাস্তব একটি রাষ্ট্রের জন্মের ছয় মাস যেতে না যেতেই আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠায়, মাতৃভাষার অধিকার অর্জনে সোচ্চার হয়ে উঠবে? পৃথিবীতে এমন দৃষ্টান্ত বিরল যে শুধু ভাষার জন্য সংগ্রাম করে, স্বাধীনতা অর্জনের বীজটি বপন করে, ২৩ বছর অতিক্রান্ত হতে না হতেই একটি প্রদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল। এর জন্য সেই প্রদেশের অধিবাসীদের সশস্ত্র যুদ্ধ করতে হয়েছে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে; এবং অবিশ্বাস্য সত্য হচ্ছে 'ভীরু, অলস, কর্মবিমুখ, কাপুরুষ, ভেতো, যুদ্ধবিদ্যায় অনভিজ্ঞ' এই বাঙালিই মাত্র নয় মাসে স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছে।

এই অসম্ভব কাজটি করা সম্ভব হয়েছে, কারণ এটি ছিল জনযুদ্ধ। সাধারণ, অতিসাধারণ কৃষক, মজুর, জেলে, কামার, কুমার, শিক্ষক, চিকিৎসক, আইনজীবী, শিল্পী, ছাত্রছাত্রী, কন্যা, স্ত্রী এমনকি বয়স্ক নারী-পুরুষও সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন; যুদ্ধে অনেক প্রবীণ-প্রবীণা মুক্তিবাহিনীর অকুতোভয় সৈনিকদের প্রতি সর্বতোভাবে সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন।

স্বাধীনতার জন্য প্রাণের আবেগ যখন দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে, তখন পৃথিবীর যত ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্রই ব্যবহার করা হোক না কেন, সেই আবেগের কাছে তা তুচ্ছ হয়ে যায়। তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি আমেরিকা-ভিয়েতনামের যুদ্ধে। বিশ্ববাসী সেই প্রমাণ প্রত্যক্ষ করেছে ১৯৭১ সালে, বাঙালির মুক্তিযুদ্ধে।

'জনযুদ্ধ' কথাটির সূত্রেই আমরা *একাত্তরের চিঠি*র চিঠিগুলো পর্যালোচনা করলে দেখতে পাব বেশির ভাগ চিঠিই লিখেছেন তরুণ যোদ্ধারা; অল্পশিক্ষিত যুবক, স্কুল-কলেজের ছাত্র। লক্ষ করেছি, প্রায় সব চিঠি-লেখক যোদ্ধা যুদ্ধে গেছেন দেশমাতৃকার লাঞ্ছনা ও গ্লানি মোচনের লক্ষ্যে, পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙতে। তাঁদের আগে থেকে কোনো যুদ্ধপ্রস্তুতি নেই, প্রশিক্ষণ নেই, এমনকি অনেকে সামান্য গাদাবন্দুক কী, তাও জানেন না। আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র কতটা মারাত্মক, তা না জেনে যুদ্ধে অংশ নিয়ে যখন বুঝতে পারেন এ এক অসম যুদ্ধ; তখন, কী বিস্ময়, রণে ভঙ্গ না দিয়ে তাঁরা আরও বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছেন। আমাদের নিয়মিত সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাঙালি

যোদ্ধারা যুদ্ধ করেছেন প্রথামাফিক; অনিয়মিত যোদ্ধারা লড়াই করেছেন প্রাণের আবেগকে শ্রেষ্ঠ অস্ত্র বানিয়ে।

এবং এই আবেগের স্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে প্রকাশিত বেশির ভাগ চিঠিতে। উদাহরণ দেওয়া যাক : ৫ এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখে, যুদ্ধ শুরু হওয়ার মাত্র ১০ দিন পর 'তোমারই হতভাগা ছেলে' এ বি এম মাহবুবুর রহমান (সুফী) যখন লেখেন, 'মাগো, তুমি যখন এ পত্র পাবে, আমি তখন তোমার থেকে অনেক অনেক দূরে থাকব। মা, জানি তুমি আমাকে যেতে দিবে না, তাই তোমাকে না বলে চলে যাচ্ছি। তবে যেদিন মা-বোনের ইজ্জতের প্রতিশোধ এবং এই মাতৃভূমি সোনার বাংলাকে শত্রুমুক্ত করতে পারব, সেদিন তোমার ছেলে তোমার কোলে ফিরে আসবে। দোয়া করবে মা, আমার আশা যেন পূর্ণ হয়', তখন কে রোধে সেই অপ্রতিরোধ্য দেশপ্রেমিককে?

ওই সালের এপ্রিলেরই ৪ তারিখে শহীদ জিন্নাত আলী খান 'মা'কেই লিখছেন :

'মা, আমার সালাম গ্রহণ করবেন। পর সংবাদ, আমি আপনাদের দোয়ায় এখনো পর্যন্ত ভালো আছি। কিন্তু কত দিন থাকতে পারব বলা যায় না। বাংলা মাকে বাঁচাতে যে ভূমিতে আপনি আমাকে জন্ম দিয়েছেন, যে ভাষায় কথা শিখিয়েছেন, সেই ভাষাকে, সেই জন্মভূমিকে রক্ষা করতে হলে আমার মতো অনেক জিন্নার প্রাণ দিতে হবে। দুঃখ করবেন না, মা। আপনার সম্মান রক্ষা করতে গিয়ে যদি আপনার এই নগণ্য ছেলের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়, সে রক্ত ইতিহাসের পাতায় সাক্ষ্য দেবে যে বাঙালি এখনো মাতৃভূমি রক্ষা করতে নিজের জীবন পর্যন্ত বুলেটের সামনে পেতে দিতে দ্বিধা বোধ করে না।'

উদ্ধৃতি দেওয়া প্রয়োজন 'মা রাহেলা খাতুন'-এর 'হতভাগ্য ছেলে খোরশেদ'-এর ২৩ এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখে লিখিত চিঠিটির :

'মা

দোয়া করো। তোমার ছেলে আজ তোমার সন্তানদের রক্তের প্রতিশোধ নিতে চলেছে। বর্বর পাকিস্তানি জঙ্গিগোষ্ঠী আজ তোমার সন্তানদের ওপর নির্বিচারে অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। যেখানে তোমার সন্তানদের ইজ্জতের ওপর আঘাত করেছে, সেখানে তো আর তোমার সন্তানেরা চুপ করে বসে থাকতে পারে না। তাই আজ তোমার হাজার হাজার বীর সন্তানেরা বাঁচার দাবি নিয়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন করবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তোমার নগণ্য ছেলে তাদের মধ্যে একজন।'

গর্বে বুক ভরে যায় বাবার কাছে লেখা 'স্নেহের টুকরো' ছেলের চিঠি পড়ে। ১৩৭৮ সনের ২৭ আষাঢ় তারিখে মুক্তিযোদ্ধা 'হক' লিখছেন :

'আব্বা

আমার সালাম ও কদমবুচি গ্রহণ করুন। জীবনের যত অপরাধ, ক্ষমা করে দেবেন। আমি আজ চলে যাচ্ছি, জানি না আর ফিরে আসব কি না। যদি ফিরে আসতে পারি, তাহলে দেখা হবে। আল্লাহর কাছে দোয়া করেন, যেন আপনার ছেলে এ দেশের মুক্তিসংগ্রামে গাজি হতে পারে।'

লক্ষণীয়, *একাত্তরের চিঠির* বেশির ভাগ চিঠিই মাকে লেখা। চিঠিগুলো পড়ে মনে হয়, 'মা' ও 'স্বদেশ' যেন একই শব্দ, সমার্থক। ১ আগস্ট, ১৯৭১ তারিখের চিঠিতে ইসহাক খান মাকে 'ডেকে ডেকে' বলছেন, 'মাগো, তুমি আমায় ডাকছিলে? আমার মনে হলো তুমি আমার শিয়রে বসে কেবলই আমার নাম ধরে ডাকছ। তোমার অশ্রুজলে আমার বক্ষ ভেসে যাচ্ছে, তুমি এত কাঁদছ? আমি তোমার ডাকে সাড়া দিতে পারলাম না। তাই আমায় ডেকে ডেকে হয়রান হয়ে গেলে।'

১৯ নভেম্বর, ১৯৭১ 'যুদ্ধখানা হইতে তোমার পোলা' নুরুল হক 'মা'কে লেখেন, 'আমার মা, আশা করি ভালোই আছ। কিন্তু আমি ভালো নাই। তোমায় ছাড়া কীভাবে ভালো থাকি! তোমার কথা শুধু মনে হয়। আমরা ১৭ জন। তার মধ্যে ৬ জন মারা গেছে, তবু যুদ্ধ চালাচ্ছি। শুধু তোমার কথা মনে হয়, তুমি বলেছিলে, "খোকা মোরে দেশটা স্বাধীন আইনা দে," তাই আমি পিছুপা হই নাই, হবো না, দেশটাকে স্বাধীন করবই। রাত শেষে সকাল হইব, নতুন সূর্য উঠব, নতুন একটা বাংলাদেশ হইব...,

উচ্চারণের দৃঢ়তাই আমাদের সচকিত করে, জাগিয়ে রাখে—সাধারণ খেটে খাওয়া বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ বৃথা যেতে পারে না। 'মা' শব্দটিই যেন প্রধান অবলম্বন, ১৬ জুলাই, ১৯৭১ তারিখে মা মোছাম্মৎ রফিয়া খাতুনের কাছে মুক্তিযোদ্ধা ছেলে মো. আব্দুর রউফ ববিন জানতে চান, 'আচ্ছা মা, সারা রাত এমনি চলার পর পূর্বাকাশে যে লাল সূর্য ওঠে, তার কাঁচা আলো খুব উজ্জ্বল হয়, তাই না?' মাকে তিনি এটাও জানান : '...একা বাইরে যেতে সাহস পেতাম না। ভয় লাগত। বাইরে গেলেই পড়ে যাব। কিন্তু আজ! আজ আমার অনেক সাহস হয়েছে। রাইফেল ধরতে শিখেছি। বাঙ্কারে রাতের পর রাত কাটাতে হচ্ছে, তবুও ভয় পাই না।'

৪ অক্টোবর, ১৯৭১ তারিখে মুক্তিযোদ্ধা দুলাল মায়ের মাধ্যমে অধিকৃত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার মতো প্রতিটি সন্তানকে এভাবেই আহ্বান জানান :

'মাগো—বাংলার প্রতিটি জননী কি তাদের ছেলেকে দেশের তরে দান করতে পারে না—পারে না মা-বোনেরা ভাইদের পাশে এসে দাঁড়াতে? তুমিই তো একদিন বলেছিল, সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন এ দেশের শিশুরা মা-বাবার কাছে বিস্কুট-চকলেট না চেয়ে চাইবে পিস্তল-রিভলবার। সেদিনের আশায় পথ চেয়ে আছে বাংলার প্রতিটি সন্তান, যেদিন বাংলার স্বাধীনতার সূর্যে প্রতিফলিত হবে অধিকারবঞ্চিত, শোষিত, নিপীড়ত, বুভুক্ষু সাড়ে সাত কোটি বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষা।'

এভাবে অজস্র উদাহরণ দেওয়া যায়। প্রকাশ করা যায় স্ত্রী ফাতেমা বেগম অনুকে লেখা চিঠিতে (২০.৭.৭১) স্বামী পাটোয়ারি নেসারউদ্দিন নয়নের আকুতির কথা : 'লক্ষ্মী আমার—মানিক আমার—চিন্তা কোরো না। তোমার নয়ন কুশলেই আছে।' যক্ষ যেমন মেঘদূতের মাধ্যমে তাঁর প্রিয়ার কাছে বারতা পাঠায় তেমনি পাহাড়ি অঞ্চল থেকে নয়নও সমতলের দিকে ধাবিত বর্ষার জলরাশির মাধ্যমে জানায় :

'পাহাড়ের শ্যামল বনরাজির এ মেলায় প্রায় প্রতিদিন বর্ষা নামে চারদিক অন্ধকার করে। বর্ষার অশান্ত বর্ষণে পাহাড়ি ঝরনায় তখন মাতন নেমে আসে। দুর্বার বেগে ঝরনার সে জলধারা কলকল গান করে এগিয়ে চলে সমতলের দিকে। আমার মনের সবটুকু মাধুরী ঢেলে তখন সে ধারাকে কানে কানে বলি—ওগো ঝরনার ধারা, তুমি সমতলের দেশে গিয়ে আমার অনুকে আমার এ বারতা বলে দিয়ো—ওকে আমার একান্ত কাছে পাই যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে। নিকষ কালো অন্ধকারের একাকিত্ব তখন আর থাকে না।'

এই চিঠিতেই নয়ন আরও লেখেন :

'গকুলনগর থাকতে কী মজার ব্যাপার হয়েছিল তা অনেক দিন পর হলেও লিখে আজকের লেখার ইতি টানব। কী কারণে যেন সেদিন সারা বেলা উপোস থাকতে হয়েছিল। খাওয়া আর হয়ে ওঠেনি। সকালবেলাতেও না—রাতেও না। একেবারে কিছু না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুমিয়ে পড়েও কিন্তু ঘুমিয়ে থাকতে পারিনি।

"তুমি এসে ঘুমের বারটা বাজিয়ে হরেক রকমের এত খানা খাইয়ে দিয়েছ যে আর খেতে পারি না বলে তোমার হাত চেপে ধরে যেই দুষ্টুমি করতে গিয়েছি, অমনি ঘুম ভেঙে গেল। নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে দেখি আমি বাড়িতে শুয়ে নেই। সুউচ্চ পাহাড়ের মালভূমিতে তাঁবুর এক

কোণ ঘেঁষে আমার ব্যাগটার (যেটা বালিশের কাজ দিচ্ছিল) হ্যান্ডেল ধরে ওপরের দিকে চেয়ে আছি। তাঁবুর সামনের পর্দা সরিয়ে দেখি ভোর হতে আর দেরি নেই।...সেই যে একদিন এলে—এরপর আর আসনি। এলেই তো পার!'

২.

এ ছাড়া *প্রথম আলো*তে পাঠানো চিঠির মধ্যে আমরা পেয়েছি পুত্রকে লেখা পিতার চিঠি; কন্যাকে লেখা উদ্বিগ্ন পিতার পত্র, কন্যা ও জামাতা, বন্ধু, মুক্তিযোদ্ধা, সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যের যুদ্ধসংশ্লিষ্ট নির্দেশসংবলিত চিঠি। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, 'মা' ও 'স্বদেশ' সমার্থক বলে 'মা'র কাছে লেখা চিঠির সংখ্যাই সর্বাধিক।

প্রথম আলো-গ্রামীণফোন 'একাত্তরের চিঠি' গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার উদ্যোগ নিচ্ছে—বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমে এমন ঘোষণা দেওয়ার পর অভূতপূর্ব সাড়া লক্ষ করা যায়। এসেছে অনেক চিঠি, অসংখ্য ফোন; *গ্রামীণফোন ও প্রথম আলো* অফিসে ব্যক্তিগতভাবেও এসেছেন অনেকে। লক্ষণীয়, শুধু ১৯৭১ সালে লেখা সাধারণ চিঠিও এনেছেন কেউ কেউ। সবার আবেগের প্রতি সম্মান জানিয়ে নিবেদন করি : আমরা শুধু সেই সব চিঠিই রাখতে চেষ্টা করেছি, যেগুলোতে অন্তত আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ-সম্পর্কিত কিছু না কিছু উপাদান আছে; তথ্য আছে। সন্দেহাতীতভাবে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এই উপাদান ও তথ্য মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ও তথ্যপূর্ণ ইতিহাস প্রণয়নে অধিকতর সহায়তা করবে। আর, সেটা হলেই প্রথম আলো-গ্রামীণফোনের এ উদ্যোগ সার্থক বলে বিবেচিত হবে, সন্দেহ নেই।

সম্মানিত পাঠকের অবগতির জন্য পেশ করি : লক্ষ করবেন, প্রতিটি চিঠি ছাপা হয়েছে দুইভাবে। ১. মূল হাতের লেখা, অর্থাৎ ১৯৭১ সালে যেভাবে লেখা হয়েছিল সেটাই অবিকৃত রেখে পাঠকের সামনে অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়েছে, যাতে পাঠক চিঠি-লেখকের হস্তলিখনের সঙ্গে পরিচিত হন। মূল চিঠির কোনো বানানে হাত দেওয়া হয়নি; উপস্থাপনায় সাধু বা চলিত, কিংবা গুরুচণ্ডালী যা-ই থাক, অবিকল রয়েছে। কারণ মূল লেখায় হস্তক্ষেপ কখনোই আমাদের কাম্য ছিল না।

২. সম্পূর্ণ প্রকাশিত প্রায় প্রতিটি চিঠি সম্পাদিত। কারণ, চিঠির বক্তব্য যাতে পাঠকের কাছে স্পষ্ট থাকে, উপলব্ধিতে কোনো আবিলতা না থাকে। আমরা চিঠির ভাষাবৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রাখার জন্য চলিত কিংবা সাধু, যে রীতির প্রাধান্য বেশি, সেই রীতিকেই গুরুত্ব দিয়েছি। তবে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, চিঠির মেজাজ যাতে বহাল থাকে, সেদিকেও আমরা যথাসাধ্য সতর্ক দৃষ্টি রাখতে চেষ্টা করেছি; মূল চিঠির অশুদ্ধ বানান সম্পাদিত চিঠিতে শুদ্ধ করা হয়েছে; আমরা বানান-সাম্য রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। এর পরও কোনো ভুল-ত্রুটি বা অস্পষ্টতা কিংবা অসম্পূর্ণতা পরিলক্ষিত হলে পূর্বেই মার্জনা প্রার্থনা করছি।

চিঠির তারিখ ও মাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে ক্যালেন্ডারের প্রচলিত নিয়মই অনুসরণীয়।

চিঠি সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমাদের প্রচেষ্টা ছিল আন্তরিক। চিঠির সত্যতা নিরূপণের জন্য *প্রথম আলো*র প্রতিনিধি পাঠানো হয়েছে; চিঠি প্রাপ্তির সূত্র সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য *প্রথম আলো*র স্থানীয় প্রতিনিধি তো বটেই, টেলিফোনে খোঁজ নেওয়া হয়েছে, প্রবীণ, গণ্যমান্য ব্যক্তিরও শরণাপন্ন হওয়ার চেষ্টা ছিল নিরন্তর। এত সব সত্ত্বেও, যদি কোনো তথ্য অসত্য প্রমাণিত হয়, তাহলে পরবর্তী সংস্করণে তা অবশ্যই শুদ্ধ করা হবে, সংশোধন করা হবে।

প্রশ্ন আসতে পারে, চিঠির সংখ্যা আশানুরূপ নয় কেন? এ ক্ষেত্রে সবিনয় জবাব : আমাদের আন্তরিকতা ছিল, এবং তা এখনো বিদ্যমান। আমরা অকৃত্রিমভাবেই চেয়েছি আরও, আরও বিপুল চিঠি আসুক; জনগণ একাত্তরকে জানুক। আশানুরূপ না আসার কারণগুলো এমন হতে পারে—যুদ্ধে যাঁরা গেছেন, তাঁদের অনুল্লেখ্য শিক্ষাগত যোগ্যতা, নিরক্ষর, অল্প শিক্ষিত যোদ্ধার

সংখ্যাও ছিল বিশাল। সংঘটিত যুদ্ধের ব্যাপ্তি মাত্র নয় মাস হলেও ভারত-গমন, ভারতে বা দেশেরই কোথাও প্রথমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ, কোনো একটা স্থান বা ঘাঁটিতে স্থিত হওয়া, চিঠি লেখার উপাদান সংগ্রহ, ডাকঘর বা লোক মারফত পাঠানোর অনিশ্চয়তা, ঝুঁকি প্রভৃতি বিরাট বাধা বলে প্রতীয়মান হয়েছে। উপরন্তু অনেকে চিঠি পেয়েও পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছিঁড়ে বা পুড়িয়ে ফেলেছেন; ছেঁড়া টুকরো বা ছাইও অবশিষ্ট রাখেননি।

এ ছাড়াও আরেকটি বড় কারণ হচ্ছে: মুক্তিযুদ্ধের ৩৭-৩৮ বছর পর এমন উদ্যোগ মহৎ বলে বিবেচিত হলেও ধারণা করা যায়, এত দিন বা এতগুলো বছর প্রাপ্ত বহু চিঠি সঠিকভাবে ও যত্নসহকারে সংরক্ষিত হয়নি। অন্তত স্বাধীনতা লাভের পাঁচ-সাত বছরের মধ্যে এমন উদ্যোগ নিলে আরও অনেক চিঠি পাওয়া যেত।

সহৃদয় পাঠক, আশা করি লক্ষ করবেন, কোনো কোনো চিঠির মধ্যে (...) ব্যবহার করা হয়েছে। প্রকৃত বিষয় হচ্ছে, লিখিত ওই শব্দটি বা শব্দগুচ্ছ কোনোভাবেই আমাদের পক্ষে পাঠোদ্ধার করা বা বোঝা সম্ভব হয়নি।

৩.

কোনো মহৎ চেষ্টা কখনো বৃথা যায় না। বিলম্বে হলেও প্রথম আলো-গ্রামীণফোনের এ উদ্যোগ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে একটি স্থায়ী আসন লাভ করবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। আর সেই সঙ্গে আমরা আশা করি, এভাবেই *গ্রামীণফোন* ও *প্রথম আলোর* মতো দেশের বড় বড় প্রতিষ্ঠান —একার পক্ষে সম্ভব নয়—এমন আরও অনেক বড় ও মহৎ উদ্যোগ হাতে নেবে, যাতে নতুন প্রজন্ম পাবে নতুন বিজয়ের শক্তি। এগিয়ে যাবে দেশ।

'একাত্তরের চিঠি' যাচাই-বাছাই করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সভাপতি ইতিহাসবিদ অধ্যাপক সালাহউদ্দীন আহমদ; সদস্য মে. জে. (অব.) আমিন আহম্মেদ চৌধুরী, রশীদ হায়দার, সেলিনা হোসেন এবং নাসির উদ্দীন ইউসুফ। কমিটিকে সহায়তা করেন সাজ্জাদ শরিফ, সাইফুল আজিম, তারা রহমান প্রমুখ।

এই উদ্যোগকে সর্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁরা হচ্ছেন গাউসুল আলম শাওন, শাফকাত ওয়াসি ও তারান্নুম বুশরা। তাঁরা সবাই গ্রে অ্যাডভার্টাইজিং বাংলাদেশ লিমিটেডের কর্মী।

তবে সর্বশেষ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আমিনুল আকরামের নাম। তিনিই প্রথম 'একাত্তরের চিঠি' সংগ্রহ করার ধারণা পোষণ করেন। সেই ধারণা বাস্তবায়নের জন্য তিনি বিভিন্ন সময় সূত্র ও তথ্য দিয়ে আমাদের কর্মপ্রচেষ্টাকে বেগবান করেছেন।

বাংলাদেশের যেকোনো প্রজন্মের জন্য *একাত্তরের চিঠি* কার্যকর প্রমাণিত হলে আমাদের শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

'একাত্তর'-এর আবেদন যে এখনও গভীর, তার প্রমাণ 'একাত্তরের চিঠি'-র অভাবিত চাহিদা। ২৭ মার্চ, ২০০৯ তারিখে প্রথম প্রকাশিত হওয়ার পর পাঠককুলের অবিশ্বাস্য আগ্রহের কারণে, কিছু প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

রশীদ হায়দার

সম্পাদনা পরিষদের পক্ষে

একাত্তরের চিঠি

২৯শে মার্চ/রাজশাহী '৭১

আম্মা,

সালাম নেবেন।

আমি ভালো আছি এবং নিরাপদেই আছি। দুশ্চিন্তা করবেন না। আব্বাকেও বলবেন। দুশ্চিন্তা মনঃকষ্টের কারণ ছাড়া আর কোনো কাজে আসে না। এখানে গতকাল ও পরশু Police বনাম Army-র মধ্যে সাংঘাতিক সংঘর্ষ হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত আমরা জিততে পারিনি।

রাজশাহী শহর ছেড়ে লোকজন সব পালাচ্ছে। শহর একদম খালি। Military কামান ব্যবহার করেছে। ২৫০-র মত Police মারা গিয়েছে। ৪ জন Army মারা গিয়েছে। মাত্র।

রাজশাহীর পরিস্থিতি এখন Army-র আয়ত্তাধীনে রয়েছে। হাদী দুলাভাই ভাল আছেন। চিন্তার কারণ নেই। দুলি আপার খবর বোধহয় ভালোই। অন্য কোথায় যেন আছেন। আমি যাইনি সেখানে।

পুষ্প আপা সমানে কাঁদাকাটি করে চলেছেন। ঢাকার ভাবনায়। ক'দিন আগে গিয়েছিলাম। ধামকুড়িতে বোধহয় উনার মা আছেন। সম্ভব হলে খবর পৌঁছে দেবেন। আমার জন্য ব্যস্ত হবেন না। যেভাবে সাধারণ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, সেখানে আমাদের বেঁচে থাকাটাই লজ্জার। আপনাদের দোয়ার জোরে হয়তো মরব না। কিন্তু মরলে গৌরবের মৃত্যুই হতো। ঘরে শুয়ে শুয়ে মরার মানে হয় কি?

এবার জিতলে যেমন করে হোক একবার নওগাঁ যেতাম। কিন্তু জিততেই পারলাম না। হেরে বাড়ি যাওয়া তো পালিয়ে যাওয়া। পালাতে বড্ড অপমান বোধহয়। হয়তো তবু পালাতেই হবে। আব্বাকে সালাম। দুলুরা যেন অকারণ কোনোরকম risk না নেয়। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বললাম কথাটা। তাতে শুধু শক্তি ক্ষয়ই হবে।

দোয়া করবেন।

ইতি

বাবুল, ২৯/৩

চিঠি লেখক : শহীদ কাজী নূরুন্নবী। ১৯৭১ সালে রাজশাহী মেডিকেল কলেজের শেষ বর্ষের ছাত্র এবং কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধকালে মুজিব বাহিনীর রাজশাহীর প্রধান ছিলেন। ১ অক্টোবর ১৯৭১ নূরুন্নবীকে পাকিস্তানি বাহিনী আটক করে শহীদ জোহা হলে নিয়ে যায়। তাঁর আর খোঁজ পাওয়া যায়নি। রাজশাহী মেডিকেল কলেজের একটি হোস্টেল তাঁর নামে রয়েছে।

চিঠি প্রাপক : মা নূরুস সাবাহ্ রোকেয়া। শহীদের বাবার নাম কাজী সাখাওয়াত হোসেন, ঠিকানা : লতা বিতান কাজী পাড়া, নওগাঁ।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : ডা. কিউ এস ইসলাম, ২৮ শান্তিনগর, ঢাকা।

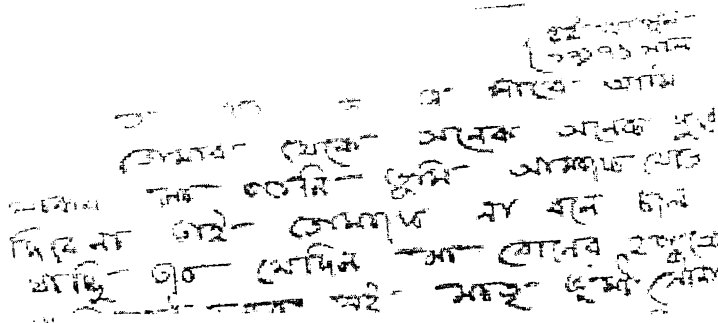

৫ এপ্রিল ১৯৭১ সাল

মাগো,

তুমি যখন এ পত্র পাবে, আমি তখন তোমার থেকে অনেক অনেক দূরে থাকব। মা, জানি তুমি আমাকে যেতে দিবে না, তাই তোমাকে না বলে চলে যাচ্ছি। তবে যেদিন মা-বোনের ইজ্জতের প্রতিশোধ এবং এই মাতৃভূমি সোনার বাংলাকে শত্রুমুক্ত করতে পারব, সেদিন তোমার ছেলে তোমার কোলে ফিরে আসবে।

দোয়া করবে মা, আমার আশা যেন পূর্ণ হয়।

ইতি তোমারই

হতভাগা ছেলে।

সেই গাঢ় অন্ধকারে একাকী পথ চলছি—শরীরের রক্ত মাঝে মাঝে টগবগিয়ে উঠছে, আবার মনে ভয় জেগে উঠছে যদি পাকসেনাদের হাতে ধরা পড়ি তবে তো সব আশাই শেষ...। যশোর হয়ে নাগদা বর্ডার দিয়ে ভারতে প্রবেশ করি। পথে একবার রাজাকারদের হাতে ধরা পড়ি। তারা শুধু টাকা-পয়সা ও চার-পাঁচটা হিন্দু যুবতী মেয়েকে নিয়ে আমাদের ছেড়ে দেয়। তখন একবার মনে হয়েছিল, নিজের জীবন দিয়ে মেয়েদের ওদের হাত থেকে রক্ষা করি। কিন্তু পরমুহূর্তে মনে হয়, না, এভাবে তাদের উদ্ধার করতে গেলে শুধু প্রাণটাই যাবে, তাহলে হাজার হাজার মা-বোনের কী হবে?

রাত চারটার দিকে বর্ডার পার হয়ে ভারতে প্রবেশ করি। বাল্যবন্ধু শ্রী মদন কুমার ব্যানার্জি, ইত্না কলোনি, শিবমন্দির, বারাসাত, ২৪ পরগনা এই ঠিকানায় উঠলাম। ওখানে এক সপ্তাহ থেকে ওই বন্ধুর বড় ভাই শরৎচন্দ্র ব্যানার্জি আমাকে বসিরহাট মহকুমা ৮ নম্বর সেক্টর মেজর জলিলের তত্ত্বাবধানে আমাকে মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিংয়ে ভর্তি করে দেন। সেখানে পরিচয় হয় বে. রেজিমেন্টের আবুল ভাইয়ের সাথে। ট্রেনিং ক্যাম্পে এক সপ্তাহ থাকার পর কর্নেল ওসমান গনির নির্দেশে আমাদেরকে উচ্চ ট্রেনিং... (অসম্পূর্ণ)..

চিঠি লেখক : মুক্তিযোদ্ধা এ বি এম মাহবুবুর রহমান। তিনি চিঠিটি লিখেছিলেন ৮ নম্বর সেক্টর হেডকোয়ার্টার, ট্রেনিং সেশন, বসিরহাট সাব ডিভিশন, ২৪ পরগনা, ভারত থেকে।
তাঁর বর্তমান ঠিকানা : বাড়ি ৭ (দোতলা), সড়ক ১৮, ব্লক জি/১, সেকশন ২, মিরপুর, ঢাকা।

চিঠি প্রাপক : মা রাহেলা বেগম রাঙা, আখালিপাড়া, নদীয়ার চাঁদঘাট, বোয়ালমারী, ফরিদপুর।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : লেখক নিজেই।

৫.৪.১৯৭১

মা,

আমার সালাম গ্রহণ করবেন। পর সংবাদ আমি আপনাদের দোয়ায় এখনো পর্যন্ত ভালো আছি। কিন্তু কত দিন থাকতে পারব বলা যায় না। বাংলা মাকে বাঁচাতে যে ভূমিতে আপনি আমাকে জন্ম দিয়েছেন, যে ভাষায় কথা শিখিয়েছেন, সেই ভাষাকে, সেই জন্মভূমিকে রক্ষা করতে হলে আমার মতো অনেক জিন্নার প্রাণ দিতে হবে। দুঃখ করবেন না, মা। আপনার সম্মান রক্ষা করতে গিয়ে যদি আপনার এই নগণ্য ছেলের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়, সে রক্ত ইতিহাসের পাতায় সাক্ষ্য দেবে যে বাঙালি এখনো মাতৃভূমি রক্ষা করতে নিজের জীবন পর্যন্ত বুলেটের সামনে পেতে দিতে দ্বিধা বোধ করে না।

সময় নেই। হয়তো আবার কখন দৌড় দিতে হয় জানি না। তাই এই সামান্য পত্রটা দিলাম। শুধু দোয়া করবেন। সবার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।

মা, যদি সত্যি আমরা এই পবিত্র জন্মভূমি থেকে ইংরেজ বেনিয়াদের মতো পাঞ্জাবি গুণ্ডাদের তাড়িয়ে দিয়ে এ দেশকে মুক্ত করতে পারি, তবে হয়তো আবার আপনার সঙ্গে দেখা হতে পারে। বিদায় নিচ্ছি মা। ক্ষুদিরামের মতো বিদায় দাও। যাবার বেলায় ছালাম।

মা...মা...মা...যাচ্ছি।

ইতি

জিন্না

চিঠি লেখক : নৌ কমান্ডো শহীদ জিন্নাত আলী খান। পিতা সামসুল হক খান, গ্রাম : ননীক্ষির, ডাক : ননীক্ষির, উপজেলা মুকসুদপুর, জেলা : গোপালগঞ্জ।

চিঠি প্রাপক : মা শুকুরুননেছা।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : ইয়াসির আরাফাত খান।

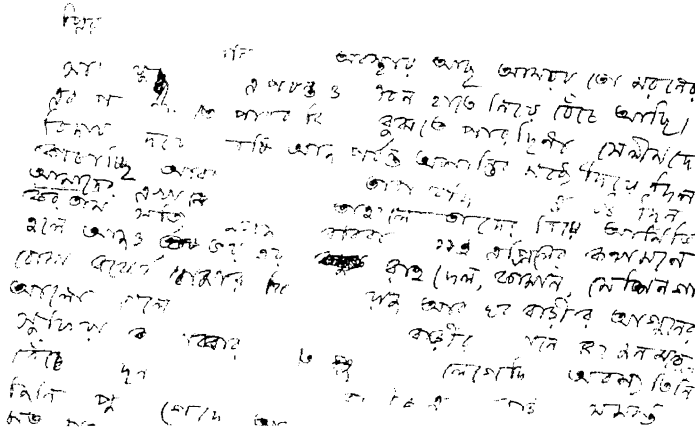

তারিখ : ১৬/০৪/৭১

প্রিয় ফজিলা,

জানি না কী অবস্থায় আছ। আমরা তো মরণের সঙ্গে যুদ্ধ করে এ পর্যন্ত জীবন হাতে নিয়ে বেঁচে আছি। এর পরে থাকতে পারব কি না বুঝতে পারছি না। সেলিমদের বিদায় দিয়ে আজ পর্যন্ত অশান্তির মধ্যে দিন কাটাচ্ছি। আবার মনে হয় তারা যদি আর একটা দিন আমাদের এখানে থাকত তাহলে তাদের নিয়ে আমি কী করতাম। সত্যিই ফজিলা, রবিবার ১১ এপ্রিলের কথা মনে হলে আজও ভয় হয়। রাইফেল, কামান, মেশিনগান, বোমা, রকেট বোমার কী আওয়াজ আর ঘরবাড়ির আগুনের আলো দেখলে ভয় হয়। সুফিয়ার বাড়ির ওখানে ৪২ জন মরেছে। সুফিয়ার আব্বার হাতে গুলি লেগেছিল। অবশ্য তিনি বেঁচে আছেন। সুফিয়াদের বাড়ি এবং বাড়ির সব জিনিস পুড়ে গেছে। আমাদের বাড়িতে তিন-চার দিন শোয়ার মতো জায়গা পাইনি। রাহেলাদের বাড়ির সবাই, ওদের গ্রামের আরও ১৫-১৬ জন, সুফিয়ার বাড়ির পাশের বাড়ির চারজন, দুলালের বাড়ির সকলে, দুলালের ফুফুজামাই দীঘির কয়েকজন এসে বাড়িতে উঠল। তাই বলি, সেই দিন যদি আব্বা এবং সেলিমরা থাকত তাহলে কী অবস্থা হতো। এদিকে আমরাও আবার পায়খানার কাছে জঙ্গলে আশ্রয় নিলাম। কী যে ব্যাপার, থাকলে বুঝতে। বর্তমানে যে পরিস্থিতি তা আর বলার নয়, রাস্তার ধারের মানুষের জীবনের নিরাপত্তা নেই। রোজ গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগি ছাড়াও যুবতী মেয়েদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে। দুই-এক দিন পর আধা মরা অবস্থায় রাস্তার ধারে ফেলে দিয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেক দিন এসব ঘটনা। বাড়িতে আগুন আর গুলি করে মানুষ মারার তো কথাই নেই। তা ছাড়া লুটতরাজ, চুরি, ডাকাতি সব সময় হচ্ছে। কয়েক দিন বৃষ্টির জন্য রাস্তাঘাটে কাদা হওয়ায় আমরা বেঁচে আছি। রাস্তাঘাট শুকনা

থাকলে হয়তো আমাদের এদিকেও আসত। জানি না ভবিষ্যতে কী হবে। তবে ওরা শিক্ষিত এবং হিন্দুদের আর রাখবে না বলে বিশ্বাস। হিন্দু এবং ছাত্রদের সামনে পেলে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করছে। গত রাতে পাশের গ্রামে এক বাড়িতে ডাকাতরা এসে সেই বাড়ির মানুষদের যা মেরেছে তা আর বলার নয়। কখন যে কী হয় বলার নেই। তবু খোদা ভরসা করে বেঁচে আছি। আমাদের এদিকের ছেলেরা প্রায় সবাই বাড়ি ছেড়ে দূরে থাকে। কারণ বাড়িতে থাকা এ সময় মোটেই নিরাপদ নয়। তোমাদের দেখার জন্য চৌবাড়ি যাওয়ার অনেক চেষ্টা করেছি। দুঃখের বিষয়, একটি দিনও বৃষ্টি থামেনি। অবশ্য বৃষ্টি না থামার জন্য আমাদের একটু সুবিধাই হয়েছে। তোমাদের সংবাদ জানানোর মতো কোনো পথও নেই। কীভাবে যে সংবাদ পাব ভেবে পাই না। মিঠু বোধ হয় এখন হাঁটতে শিখেছে তাই না? মিঠুকে দেখতে খুব ইচ্ছে করছে। কিন্তু পথ নেই। সান্ত্বনা এইটুকুই যে বেঁচে থাকলে একদিন দেখা হবে। কিন্তু বাঁচাটাই সমস্যা। রাতে ঘুম নেই, দিনে পালিয়ে বেড়াই। মা-বাবা তো প্রায়ই আমার জন্য কাঁদে। যাক, দোয়া কোরো যেন ভালো থাকতে পারি। বুবুদের যে কী অবস্থায় পাঠিয়েছি, তা মনে হলে দুঃখ লাগে। আমি সঙ্গে যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সম্ভব হয়নি। অবশ্য সেদিন না পাঠালে তাদের নিয়ে দারুণ মুশকিলে পড়তে হতো। রবিবার দিন বাবলুর আম্মা মেরীগাছা এসেছিল। বাবলুরা ভালো আছে। তোমাদের সংবাদটা জানাতে পারলে জানাবে। আমার মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা ভীষণ খারাপ। বুবু, আম্মা, দুলাভাইকে আমার সালাম এবং সেলিমদের ও মিনাদের আমার স্নেহ দেবে। সম্ভব হলে তোমাদের সংবাদটা জানাবে। আমরা তো মরেও কোনো রকমে বেঁচে আছি। শেষ পর্যন্ত কী হবে জানি না।

ইতি

আজিজ

চিঠি লেখক : শহীদ মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল আজিজ।

চিঠি প্রাপক : স্ত্রী ফজিলা আজিজ।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : মো, ফারুক জাহাঙ্গীর, গ্রাম : কুজাইল, নাটোর। ফারুক জাহাঙ্গীর শহীদ মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল আজিজের পুত্র।

১৮/৪/৭১

মা,

আপনি এবং বাসার সবাইকে সালাম জানিয়ে বলছি, দেশের এই সংকটময় মুহূর্তে আমি ঘরে বসে থাকতে পারি না। তাই ঢাকার আরও ২০টা যুবকের সাথে আমিও পথ ধরেছি ওপার বাংলায়। মা, তুমি কেঁদো না, দেশের জন্য এটা খুব ন্যূনতম চেষ্টা। মা, তুমি এ দেশ স্বাধীনের জন্য দোয়া করো। চিন্তা করো না, আমি ইনশাল্লাহ বেঁচে আসব। আমি ৭ দিনের মধ্যেই ফিরে আসতে পারি কি বেশিও লাগতে পারে। তোমার চরণ মা, করিব স্মরণ। আগামীতে সবার কুশল কামনা করে খোদা হাফেজ জানাচ্ছি।

তোমারই বাকী (সাজু)

চিঠি লেখক : শহীদ আবদুল্লাহ হিল বাকী (সাজু), বীর প্রতীক। পিতা : এম এ বারী।

চিঠি প্রাপক : মা আমেনা বারী, ২০৩/সি বাকী ভবন, খিলগাঁও, ঢাকা।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : মনজুর-উর রহমান ও নাজা রাসকিন।

২৩/৪/৭১

মা,

দোয়া করো। তোমার ছেলে আজ তোমার সন্তানদের রক্তের প্রতিশোধ নিতে চলেছে। বর্বর পাকিস্তানি জঙ্গিগোষ্ঠী আজ তোমার সন্তানদের ওপর নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। যেখানে তোমার সন্তানদের ইজ্জতের ওপর আঘাত করেছে, সেখানে তো আর তোমার সন্তানরা চুপ করে বসে থাকতে পারে না। তাই আজ তোমার হাজার হাজার বীর সন্তান বাঁচার দাবি নিয়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন করবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে। 'তোমার নগণ্য ছেলে তাদের মধ্যে একজন।' পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে দু হাত তুলে দোয়া করি তোমার সন্তানরা যেন বর্বর পাকিস্তানি জঙ্গিগোষ্ঠীকে কতল করে এ দেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করতে পারে। 'এ দেশের নাম হবে বাংলাদেশ', সোনার বাংলাদেশ। এ দেশের জন্য তোমার কত বীর সন্তান শহীদ হয়ে গিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। ইনশাল্লাহ্ শহীদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না। দেশকে স্বাধীন করে ছাড়বই। জয় আমাদের সুনিশ্চিত। দোয়া করো যেন জয়ের গৌরব নিয়ে ফিরে আসতে পারি, নচেৎ—বিদায়।

ইতি

তোমার হতভাগ্য ছেলে খোরশেদ

চিঠি লেখক : মো. খোরশেদ আলম। মুক্তিযোদ্ধা, সেক্টর ২, বর্তমান ঠিকানা : ১-ই-৭/৪ মিরপুর, ঢাকা ১২১৬।

চিঠি প্রাপক : মা রাহেলা খাতুন।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : লেখক নিজেই।

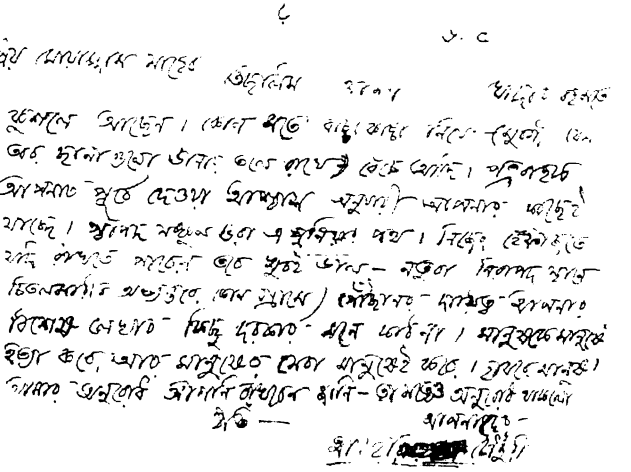

৬.৫.৭১

প্রিয় মোয়াজ্জেম সাহেব,

তসলিম। আশা করি খোদার রহমতে কুশলে আছেন। কোনোমতে বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে (মুরগি যেমন তার ছানাগুলো ডানার তলে রাখে) বেঁচে আছি। পত্রবাহক আপনার পূর্বে দেওয়া আশ্বাস অনুযায়ী আপনার কাছেই যাচ্ছে। শ্বাপদসংকুল ভরা এ দুনিয়ার পথ। নিজের হেফাজতে যদি রাখতে পারেন তবে খুবই ভালো—নতুবা নিরাপদ স্থানে (চিতলমারীর অভ্যন্তরে কোনো গ্রামে) পৌঁছানোর দায়িত্ব আপনার। বিশেষ লেখার কিছু দরকার মনে করি না। মানুষকে মানুষে হত্যা করে আর মানুষের সেবা মানুষেই করে। হায়রে মানুষ! আমার অনুরোধ আপনি রাখবেন জানি—তা সত্ত্বেও অনুরোধ থাকল।

ইতি আপনাদের

আ. হা. চৌধুরী

চিঠি লেখক : আবদুল হাসিব চৌধুরী। ১৯৭১ সালে তাঁর ঠিকানা : আমিনা প্রেস, কোর্ট মসজিদ রোড, বাগেরহাট।

চিঠি প্রাপক : মুক্তিযোদ্ধা শহীদ মো. মোয়াজ্জেম হোসেন। বাগেরহাট পি.সি. কলেজের অর্থনীতি বিভাগের প্রভাষক ছিলেন। ১৯৭১ সালের ২৮ অক্টোবর তিনি শত্রুপক্ষের গুলিতে শহীদ হন। অর্থনীতি বিষয়ে তাঁর বেশ কিছু বই বিভিন্ন কলেজে পাঠ্য হয়েছে।

চিঠিটি পাঠিয়েছে : মোয়াজ্জেম হোসেন ফাউন্ডেশন, বাগেরহাট।

তাং ২৩-০৫-১৯৭১ ইং

জনাব বাবাজান,

আজ আমি চলে যাচ্ছি। জানি না কোথায় যাচ্ছি। শুধু এইটুকু জানি, বাংলাদেশের একজন তেজোদৃপ্ত বীর স্বাধীনতাকামী সন্তান হিসাবে যেখানে যাওয়া দরকার আমি সেখানেই যাচ্ছি। বাংলার বুকে বর্গী নেমেছে। বাংলার নিরীহ জনতার ওপর নরপিশাচ রক্তপিপাসু পাক-সৈন্যরা যে অকথ্য বর্বর অত্যাচার আর পৈশাচিক হত্যালীলা চালাচ্ছে, তা জানা সত্ত্বেও আমি বিগত এক মাস পঁচিশ দিন যাবৎ ঘরের মধ্যে বিলাস-ব্যসনে মত্ত থেকে যে ক্ষমাহীন অপরাধ করেছি, আজ সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য যাত্রা শুরু করলাম। সমগ্র বাঙালী যেন আমায় ক্ষমা করতে পারেন। আপনি হয়তো দুঃখ পাবেন। দুঃখ পাওয়ারই কথা। যে সন্তানকে দীর্ঘ ষোল বছর ধরে তিল তিল করে হাতে-কলমে মানুষ করেছেন, যে ছেলে আপনার বুকে বারবার শনি কৃপাণের আঘাত হেনেছে, যে ছেলে আপনাকে এতটুকু শান্তি দিতে পারেনি, অথচ আপনি আপনার সেই অবাধ্য দামাল ছেলেকে বারংবার ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখেছেন, যার সমস্ত অপরাধ আপনি সীমাহীন মহানুভবতার সঙ্গে ক্ষমা করেছেন। আপনি আমাকে ক্ষমা করেছেন সম্ভবত একটি মাত্র কারণে যে, আপনার বুকে পুত্রবাৎসল্যের রয়েছে প্রবল আর্কষণ।

আজ যদি আপনার সেই জ্যেষ্ঠ পুত্র ফারুক স্বেচ্ছায় যুদ্ধের ময়দানে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের পক্ষে যুদ্ধে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে, তাহলে আপনি কি দুঃখ পাবেন, বাবা? আপনার দুঃখিত হওয়া সাজে না, কারণ হানাদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যদি নিহত হই, আপনি হবেন শহীদের পিতা। আর যদি গাজী হিসেবে আপনাদের স্নেহছায়াতলে আবার ফিরে আসতে পারি, তাহলে আপনি হবেন গাজীর পিতা। গাজী হলে আপনার গর্বের ধন হব আমি। শহীদ হলেও আপনার অগৌরবের কিছু হবে না। আপনি হবেন বীর শহীদের বীর জনক। কোনোটার চেয়ে কোনোটা কম নয়। ছেলে হিসেবে আমার আবদার রয়েছে আপনার ওপর। আজ সেই আবদারের ওপর ভিত্তি করেই আমি জানিয়ে যাচ্ছি বাবা, আমি তো প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী। আমার মনে কত আশা, কত স্বপ্ন। আমি প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করে কলেজে যাব। আবার কলেজ ডিঙিয়ে যাব বিশ্ববিদ্যালয়ের

অঙ্গনে। মানুষের মতো মানুষ হব আমি।

আশা শুধু আমি করিনি, আশা আপনিও করেছিলেন। স্বপ্ন আপনিও দেখেছেন। কিন্তু সব আশা, সব স্বপ্ন আজ এক ফুৎকারে নিভে গেল। বলতে পারেন, এর জন্য দায়ী কে? দায়ী যারা সেই সব নরঘাতকের কথা আপনিও জানেন। বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ ওদের কথা জানে। ইংরেজিতে একটা কথা আছে—Mother and Motherland are superior to heaven. স্বর্গের চেয়েও উত্তম মা এবং মাতৃভূমি। আমি তো যাচ্ছি আমার স্বর্গাদপী গরীয়সী সেই মাতৃভূমিকে শত্রুর কবল থেকে উদ্ধার করতে। আমি যাচ্ছি শত্রুকে নির্মূল করে আমার দেশের মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে। বাবা, শেষবারের মতো আপনাকে একটা অনুরোধ করব। সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকট সব সময় দোয়া করবেন, আমি যেন গাজী হয়ে ফিরতে পারি। আপনি যদি বদদোয়া বা অভিশাপ দেন, তাহলে আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

জীবনে বহু অপরাধ করেছি। কিন্তু আপনি আমায় ক্ষমা করেছেন। এবারও আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন, এই আশাই আমি করি। আপনি আমার শতকোটি সালাম নেবেন। আম্মাজানকে আমার কদমবুসি দেবেন এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করতে বলবেন। ফুফু আম্মাকেও দোয়া করতে বলবেন। ফয়সল, আফতাব, আরজু, এ্যানি ছোটদের আমার স্নেহাশিস দেবেন। আমার জন্য দোয়া করবেন আর সব সময় হুঁশিয়ার থাকবেন।

ইতি

আপনার স্নেহের ফারুক

চিঠি লেখক : ফারুক। শহীদ মুক্তিযোদ্ধা আমানউল্লাহ চৌধুরী ফারুক। চট্টগ্রাম সিটি কলেজিয়েট স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ থানার বামনী বাজারের দক্ষিণে বেড়িবাঁধের ওপর পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে তিনি শহীদ হন। এই যুদ্ধে আরও চার মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। চিঠিটি মৃত্যুর কদিন আগে লেখা।

চিঠি প্রাপক : বাবা হাসিমউল্লাহ চৌধুরী। ঠিকানা : অম্বরনগর মিয়াবাড়ি, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : মেজর (অব.) কামরুল হাসান ভুঁইয়া।

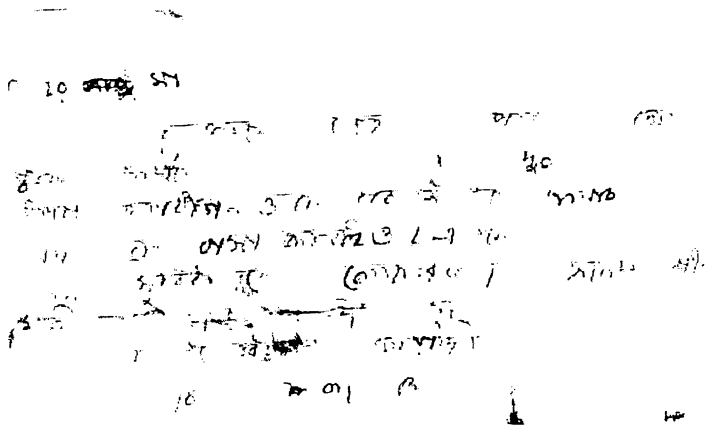

২৮.৫.১৯৭১

স্নেহের মা জানু,

আমার আন্তরিক স্নেহ ও ভালোবাসা নিয়ো। তোমার শাশুড়ি আম্মাকে আমার সালাম দিয়ো। দুলা মিয়া, পুত্রা মিয়ারা, ঝিয়ারীগণ ও সোহরাব, শিমুলকে আমার আন্তরিক স্নেহ ও ভালোবাসা জানাইয়ো। এখানে খাওয়াদাওয়ার যেমন অসুবিধা, তেমন লোকের ঝামেলাও অনেক বেশি। সেদিন তোমাদের বাড়ি হইতে আসিতে কোনো অসুবিধা হয় নাই। দেড় ঘণ্টার মধ্যে বিলোনিয়া পৌঁছিয়াছি। তোমাদের বাড়ি হইতে যেদিন ফিরিয়াছি সে রাতে মোটেই ঘুম হয় নাই। দুলা মিয়া, তুমি এবং আমার স্নেহের নাতিদের কথা মনে পড়ার সাথে সাথে ২৩/০৪/৭১ ইং তারিখে (...) তোমার মাতা, রেখা, রেণু, রুবি, রৌশন ও তার চারটি ছেলে। আমার বৃদ্ধ ও রুগ্‌ণ আব্বা ও জীবনের যৎসামান্য *২॥ লক্ষ টাকার নগদ টাকা ও সম্পদ সবকিছুর কথা। দোকান, বাসা ও মালপত্র ছাড়াও সরকারের ঘরে ৮০ হাজার টাকার মতো পাওনা রহিয়াছে। তা পাওয়া যাইবে কি না যাইবে তাহার কথা বেশি ভাবি কি না। বাংলাদেশে যখন ফিরিতে পারি এবং যদি কখনো ফিরি তবে ফেলিয়া আসা ছাইয়ের উপর দাঁড়াইয়া আবার নতুনভাবে গড়িয়া তোলার চেষ্টা করিবার আশা নিয়া বাঁচিয়া আছি। জানু, কয়েকটা কথা প্রায় দিন বারবার মনে পড়ে। এই কথাগুলো ভুলিতে পারিব দেশে ফিরিবার পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া, দেশে ফিরিয়া গিয়া, নতুবা মৃত্যুর পর। ২২/৪/৭১ ইং তারিখ দিবাগত রাত্র দেড়টার সময় দেশের বাড়ি হইতে বাহির হওয়ার সময় সকলের থেকে বিদায় নেওয়ার পর যখন আব্বার থেকে বিদায় নিতে যাই তখন আব্বা আমাকে কোনো অবস্থায় যাইতে দিবেন না বলিয়া হাত চাপিয়া ধরেন এবং জোরে কাঁদা আরম্ভ করিয়া দেন। বাড়িতে বা দেশে থাকা নিরাপদ নহে ভাবিয়া রৌশন এবং অন্যরা জোর করিয়া আব্বার হাত হইতে আমাকে

* ২॥ (আড়াই)

ছিনাইয়া লয় এবং আল্লাহর হাতে সঁপিয়া দিয়া রাত্র ২ ঘটিকার সময় সকলের কাঁদা রোল ভেদ করিয়া তোমার আম্মার সাথে দেখা করিবার জন্য কায়ুমকে সাথে লইয়া কচুয়ার পথে রওনা হই। কচুয়া একদিন থাকিয়া তোমার আম্মা, রেখা, রেণু ও রুবিকে কাঁদা অবস্থায় ফেলিয়া রাত্র ৪টার সময় রওনা হইয়া তোমার নিকট আসিয়া পৌছাই।

বাড়ি হইতে রওনা হওয়ার পূর্বেই কথা হইয়াছিল যে রৌশন পরের দিন সকালে চর চান্দিয়া রওয়ানা হইয়া যাইবে। এই ঋতুতে যে কোনো দিন সে এলাকায় থাকার অন্য বিপদ ছাড়াও ঘূর্ণিঝড়ের বিপদ যেকোনো মুহূর্তেই হইতে পারে। কোনো গত্যন্তর না থাকায় আমার প্রাণের 'মা' রৌশন ও সোনার বরন চারজন নাতিকে সমুদ্রের ঢেউয়ের মুখে ঠেলিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছি। তুমিও জানো যে তোমার মাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি তাহাদিগকে উক্ত কারণে বাসায় রাখিতে চাহিতাম।

তোমাদের সকলের মুখ উজ্জ্বল করিবার জন্য নিজের চেষ্টায় যাহা গড়িয়া তুলিয়াছিলাম, তাহা আজ অবস্থার গতি পরিবর্তনের সাথে সাথে সব ধূলিসাৎ হইয়া গেল। সবকিছু ভুলিবার চেষ্টা করিয়াও ভোলা যায় না। 'মা', তুমি অনুভব করিতে পার কি না জানি না, তবে আমার ছেলেদের অপেক্ষা তোমাদেরকে অন্তরে অধিক ভালোবাসি। সে ক্ষেত্রে আজ আমার পাঁচ মেয়েকে ভিনদেশে রাখিয়া আসিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিতেছি না। জানু, আজকে তুমি আমার একমাত্র নিকটে, তাই তোমাকে দেখিবার চেষ্টা করি। দুলা মিয়া, তুমি ও সোহরাব, শিমুলকে সামনে দেখিতে পাইলে একটু আনন্দ পাই এবং কিছুটা মনের ভাব লাঘব হয়। আত্মীয়স্বজন সকলের আগ্রহ দেখিয়া নিজেকে হালকা বোধ করি, চিন্তামুক্ত থাকি।

কায়ুম, মোতা, কবীর, আপসার ও আক্তার সব এখানে আছে। ক্যাম্পে জায়গা হয় নাই বলিয়া। এখানে ফেরত আসিয়াছে। আগামী ক্যাম্পে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। আশা, কয়েক দিনের মধ্যে যাওয়া হইবে। সোহরাব ও শিমুলের প্রতি লক্ষ রাখিয়ো। আমি ভালো। তোমাদের কুশল কামনা করি।

ইতি তোমারই

বাবা

চিঠি লেখক : মরহুম আবদুল মালেক, ফেনী জেলা চেম্বার অব কমার্স ও জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি ফেনীর বিলোনিয়া ট্রানজিট ক্যাম্পের প্রধান ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণের জন্য ফেনীর মধুপুরের নিজ গ্রাম থেকে রওনা হয়ে বিলোনিয়া ট্রানজিট ক্যাম্পে আসেন। ক্যাম্পে পৌছানোর পর এই চিঠিটি লেখেন।

চিঠি প্রাপক : মেয়ে জানু।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : ফরহাদ উদ্দীন আহাম্মদ। চিঠি লেখকের নাতি এবং জানুর দ্বিতীয় পুত্র।

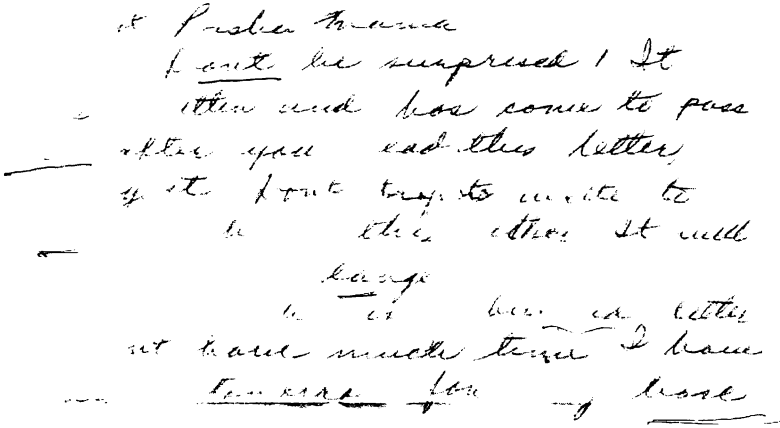

Agartala, June 16, '71

Dearest Pasha Mama,

Don't be surprised! It was written and has come to pass. And after you read this letter, destroy it. Don't try to write to Amma about this letter. It will put them in danger.

This is a hurried letter. I don't have much time. I have to leave tomorrow for my base camp.

We are fighting a just war. We shall win. Pray for us all. I don't know what to write there is so much to write about. But every tale of atrocity you hear, every picture of terrible destruction that you see is true. They have torn into us with a savagery unparalleled in human history. And sure as Newton was right, so shall we too tear into them with like ferocity. Already our war is far advanced. When the monsoons come we shall intensify our operation.

I don't know when I shall write again. Please don't write to me. And do your best for SHONAR BANGLA.

Bye for now. With love and regards.

Rumi

চিঠি লেখক : শহীদ মুক্তিযোদ্ধা রুমী। পুরো নাম শাফী ইমাম রুমী। বাবা শরীফুল আলম ইমাম আহমেদ, মা জাহানারা ইমাম।

চিঠি প্রাপক : সৈয়দ মোস্তফা কামাল পাশা। শহীদ রুমীর মামা। বর্তমান ঠিকানা : 5 Grenfell Gardens, Harrow Middlesex, HA3 0QZ, UK

সংগ্রহ : তাহমীদা সাঈদা ও শহীদজননী জাহানারা ইমাম পাঠাগার থেকে।

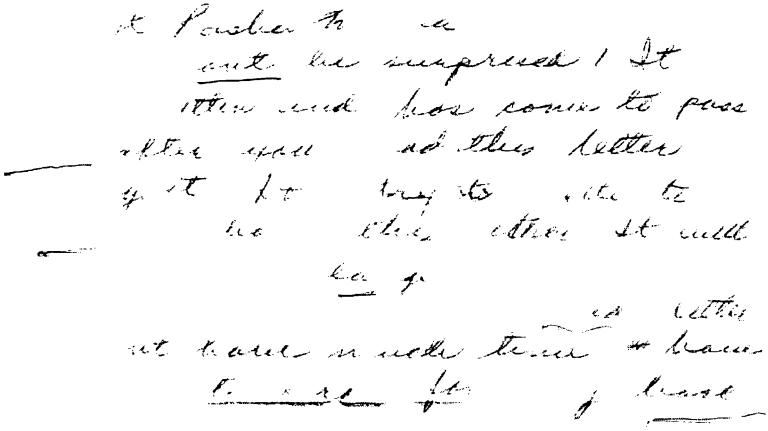

আগরতলা
১৬ জুন, '৭১

প্রিয় পাশা মামা,
অবাক হয়ো না! এটা লেখা হয়েছিল আর তোমার কাছ পর্যন্ত পৌঁছালও। পড়ার পর চিঠিটা নষ্ট করে ফেলো। এ নিয়ে আম্মাকে কিছু লিখে জানানোর চেষ্টা কোরো না। তাহলে তাদের বিপদে পড়তে হবে।
তাড়াহুড়া করে লিখলাম। হাতে সময় খুব কম। বেস ক্যাম্পের উদ্দেশে কাল এখান থেকে চলে যেতে হবে।
আমরা একটা ন্যায়সংগত যুদ্ধ লড়ছি। আমরা জয়ী হব। আমাদের সবার জন্য দোয়া কোরো। কী লিখব বুঝতে পারছি না—কত কী নিয়ে যে লেখার আছে। নৃশংসতার যত কাহিনী তুমি শুনছ, ভয়াবহ ধ্বংসের যত ছবি তুমি দেখছ, জানবে তার সবই সত্য। ওরা আমাদের নৃশংসতার সঙ্গে ক্ষতবিক্ষত করেছে, মানব-ইতিহাসে যার তুলনা নেই। আর নিউটন আসলেই যথার্থ বলেছেন, একই ধরনের হিংস্রতা নিয়ে আমরাও তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব। ইতিমধ্যে আমাদের যুদ্ধ অনেক এগিয়ে গেছে। বর্ষা শুরু হলে আমরা আক্রমণের তীব্রতা বাড়িয়ে দেব।
জানি না আবার কখন লিখতে পারব। আমাকে লিখো না। সোনার বাংলার জন্য সর্বোচ্চ যা পারো করো।
এখনকার মতো বিদায়।
ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাসহ
রুমী

* পূর্ববর্তী ইংরেজি চিঠির অনুবাদ

মহাদেও
১৬.৬.৭১ইং

হেনা,

আশা করি ভালো আছ। তোমাদিগকে খবর দেওয়া ছাড়া তোমাদের কোনো খবর পাওয়ার কোনো উপায় নেই, আর আশা করেও লাভ নেই। অনেকের নিকট বলে দেই মহিশখালীর C/O Sekandar Nuri চিঠি পাঠালে সে আমার নিকট পাঠাতে পারে। আল্লাহর নিকট শুধু প্রার্থনা এই যে, তোমরা সবাই যেন ভালো থাক। আমি অদ্য মহেশখলা থেকে তুরার পথে রওনা হয়েছি। অদ্য আমি মেঘালয় প্রদেশের মহাদেও ক্যাম্পে আছি। আমার সঙ্গে খালেক সাহেব M.P.A ও জবেদ সাহেব M.N.A আছেন। আগামীকল্য রংড়া ক্যাম্পে গিয়ে থাকবার আশা রাখি। সমস্ত পথই হেঁটে চলছি। মহেশখলা হতে রংড়া ৩৫ মাইল। রংড়া হতে গাড়ি পাওয়ার রাস্তা হবে তুরা। যা হোক আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। নানান দেশের ওপর দিয়ে চলেছি। ছোটবেলা পড়তাম, ময়মনসিংহের উত্তরে গারো পাহাড় আর এখন গারো পাহাড়ের সর্বোচ্চ টিলার উপর ১০ দিন ঘুমিয়ে এলাম আর পাহাড়ের ভিতর দিয়েই রওনা হলাম। দেশ ভ্রমণে আনন্দ আছে কিন্তু যখন তোমাদের কথা মনে হয় তখন মন ভেঙে যায়। বিশেষ করে সোহেলের কথা ভুলতেই পারি না। সোহেলটাই আমাকে বেশি বিব্রত করছে। ওর দিকে বিশেষ লক্ষ রেখো। তোমাকে আর কী লিখব। তোমরা বাড়ি থেকে সরে গেছ কি না জানি না। তোমাদের উপর আক্রমণ আসতে পারে; তাই পূর্ব পত্রে লিখেছিলাম বাড়ি থেকে সরে যেতে। কোথায় আছ

তা যেন অন্য লোক না জানে। যেখানেই যাও রাস্তায় যেন কোনো অসুবিধা না হয় তার প্রতি বিশেষ নজর রেখে চলো। সোহেল বোধহয় আমাকে খোঁজে। আস্তে আস্তে হয়তো ভুলেই যাবে। যা হোক নামাজ নিয়মিত পড়তে চেষ্টা করি। তার জন্য কোনো চিন্তা করো না। পূর্বে আরও ২টি চিঠি দিয়েছি তাতে ধান ও গাড়িটার কথাও বলেছিলাম সরিয়ে রাখতে। আজকে স্বাধীন বাংলা বেতারের খবরে নিশ্চয়ই শুনেছ যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়িও আক্রমণ করতে ছাড়েনি। সুতরাং খুব সাবধান। বিশেষ আর কি লিখব। ইচ্ছা আছে তুরা হতে ফিরে আসব আবার মহিশখালী। দোয়া করিয়ো।

আখলাক

চিঠি প্রেরক : আখলাকুল হোসেইন আহমেদ। ১৯৭০ সালে তিনি এমপি নির্বাচিত হয়েছিলেন। চিঠিটি তিনি ভারতের মেঘালয় রাজ্যের তুরা জেলার মহাদেও থেকে লিখেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি প্রথমে তুরার মহিশখালীর ক্যাম্প ইনচার্জ ছিলেন। পরে জোনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিযুক্ত হন। তাঁর বর্তমান ঠিকানা : ছায়ানীড়, মোহনগঞ্জ, নেত্রকোনা।

চিঠি প্রাপক : হেনা, লেখকের স্ত্রী। তাঁর পুরো নাম হোসনে আরা হোসেইন।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : সাইফ-উল হাসান, অ্যাপার্টমেন্ট ১ সি, বিল্ডিং ২ এ, রোড ১৩, পিসিকালচার হাউজিং সোসাইটি, আদাবর, ঢাকা।

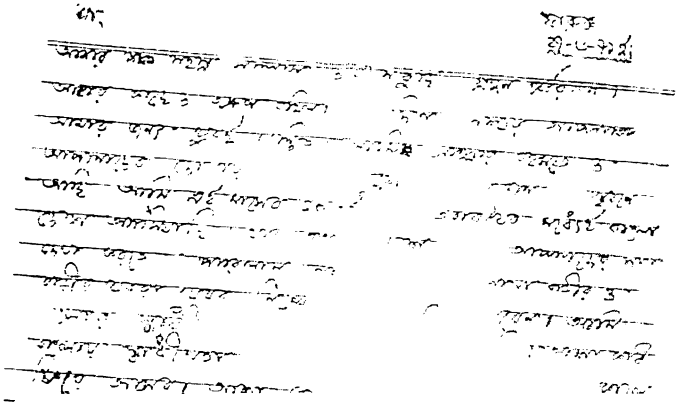

২৭.৬.১৯৭১ ইং

মা,

আমার শত সহস্র সালাম ও কদমবুসি গ্রহণ করিবেন। আব্বার কাছেও তদ্রূপ রহিল। এতদিনে নিশ্চয় আপনারা আমার জন্য খুবই চিন্তিত। আমি আল্লাহর রহমতে ও আপনাদের দোয়ায় বাংলাদেশের যেকোনো এক স্থানে আছি। আমি এই মাসের ২০ হইতে ২৫ তারিখের মধ্যেই বাংলাদেশে আসিয়াছি। যাক্, বাংলাদেশে আসিয়া আপনাদের সাথে দেখা করিতে পারিলাম না। আমাদের নানাবাড়ির ও বাড়ির খবরাখবর নিম্নের ঠিকানায় লিখিবেন। আমি বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য আসিয়াছি। আশা করি বাংলায় স্বাধীনতা আসিলেই আমি আপনাদের কোলে ফিরিয়া আসিব। আশা করি মেয়াভাই ও নাছির ভাই এবং আমাদের স্বজন বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত। যাক, বর্তমানে আমি ময়মনসিংহ আছি। এখান হইতে আজই অন্য জায়গায় চলিয়া যাইব। দোয়া করিবেন।

পরিশেষে

আপনার স্নেহমুগ্ধ

ফারুক।

জয় বাংলা

চিঠি লেখক : শহীদ ওমর ফারুক। ভোলা জেলার সদর উপজেলার চরকালী গ্রামের আনোয়ারা বেগম ও আবদুল ওদুদ পণ্ডিতের পুত্র। ১৯৭১ সালের অক্টোবরে গাইবান্ধার নান্দিনায় সংঘটিত যুদ্ধে তিনি শহীদ হন।

চিঠি প্রাপক : মা আনোয়ারা বেগম, গ্রাম : চরকালী, সদর উপজেলা, জেলা : ভোলা।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : জহুরুল কাইয়ুম, থানাপাড়া, গাইবান্ধা ও মাহমুদ আল ইসলাম, স্টার্লিং ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, ৬৬/১ নূর প্যালেস, ঢাকা ক্যান্ট, ঢাকা ১২০৬।

১৩ আষাঢ় ১৩৭৮
মহৎপুর
১.৭.১৯৭১

প্রিয় ফজিলা,

আমার অফুরন্ত ভালোবাসা নিয়ো। আমার এই চিঠির ওপর নির্ভর করছে তোমার আগামী দিনের (সুখ ও দুঃখ)। এই চিঠি পড়ে দুঃখ পাওয়ার কোনো কারণ নেই। কারণ জন্ম ও মৃত্যু মানুষের হাতে নয়, এটা পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলার হাতে। তার নির্দেশ ব্যতীত দুনিয়ার কোনো কাজ হতে পারে না। একটা পা তুললে সে (মানে করুণাময় আল্লাহ) যতক্ষণ পর্যন্ত পা ফেলার হুকুম না দেবে ততক্ষণ কারোর ক্ষমতা নেই পা ফেলে। তাই বলছি দুঃখ করো না, যে পরিস্থিতি, কখন কার মৃত্যু হয় কেউ বলতে পারে না। আমি কখন কোথায় থাকব, আমি নিজে বলতে পারি না। তাই বলছি 'আল্লাহ যদি আমার মরণ লিখে থাকে, হয়তো কোথায় কীভাবে মরণ হবে কারুর সঙ্গে দেখা হবে না, কিছু বলতেও পারব না। মনে দুঃখ থাকবে তাই আগে থেকেই লিখে যাচ্ছি। এটা পড়ে কেঁদো না। এই লিখছি বলে যে সত্যি সত্যি মরব তা তো নয়! যদি মরি তবে তো বলতে পারব না সেই জন্য লিখলাম। যদি মরি আমার দেওয়ার মতো কিছু নেই। আছে একটু ভালোবাসা আর একটু আশীর্বাদ আর ক-বিঘা জমি। আগেও বলেছি এখনো বলছি, ইচ্ছা যা-ই হোক, কারোর যুক্তি শুনে এক কাঠা জমি বিক্রি কোরো না। যদি কেউ বলে, ওখান থেকে বেচে এখানে ভালো জমি কিনে দেব, খুব সাবধান, তা করেছ কি মরেছ। আমি যদি মরি আমি দেখতে আসব না, সুখে আছ না দুঃখে আছ। তাই আমার আদেশ নয়, অনুরোধ করছি বারবার। আমার কথাগুলো শুনো। কারোর কথা শুনে কোনো কাজ করো না, তাই যতই ভালো কাজ হোক না কেন, তাতে দুঃখ পাবে, তখন আমার কথা মনে হবে। বাচ্চাটা বুকে নিয়ে থেকো, সুখে থাকবে। কারোর কথা শুনে কোনো কাজ করলে জমি তোমার থাকবে না। তখন কেউ

দেখতে পারবে না। যে মেয়ের স্বামী মরে যায় বা নেয় না, তার বাপ-ভাই আত্মীয়স্বজন কেউ ভালো চোখে দেখে না। তাই যত আদুরে হোক না, এটা মেয়েদের অভিশাপ। বেশি বলতে হবে না, পাশে অনেক প্রমাণ আছে। জমিজমা ও জিনিসপত্র থাকলে সবাই যতন করবে, তোমার পায়ের জুতো খুলে গতি হবে না। তাই বারবার অনুরোধ করছি জিনিসপত্র যা এর-ওর বাড়ি আছে, ভাই জানে, ভাইয়ের সঙ্গে সব বলা আছে। বাপের বাড়ি হোক আর (...) হোক, যেখানে হোক থেকো (...) বেশি দিন থেকো, তোমার দেখো সবাই যত্ন করবে, তবে আমি যা বলেছি মনে রেখো। মেয়েটাকে মানুষ করো। লেখাপড়া শিখাও। মামণি যখন যা চায় তখন সেটা দেবার চেষ্টা করো। তুমি তো জানো যে একটা মেয়ে হওয়ার আমার কত আশা ছিল, আল্লাহ আমার আশা পূরণ করেছে। হয়তো নিজ হাতে সেভাবে মানুষ করতে পারব না, তবু আমার আশা আছে, তুমি যদি আমার কথা শোন তবে তুমি সেভাবে মানুষ করতে পারবে। আশা করে মামণির জন্য দোলনা করেছিলাম। দোলনায় বোধহয় মামণির দোলা হলো না। বড় আশা করে হারমোনিয়াম কিনেছিলাম মামণিকে গান শেখাব, হারমনিটা নষ্ট কোরো না, তুমি শিখাও। তোমার কানেরটা—মামণিকে দেব বলে তোমার কানেরটা করলাম, মামণির সেটা তো ডাকাতরা নিয়ে গেছে। আমার আশা আশাই থেকে গেল, আশা বোধহয় পূরণ হবে না। তাই আমার আশা তুমি পূরণ করো। আর কী লিখব, সত্যি যদি মরি আমায় ঋণমুক্ত করো। তোমার কাছে যে ঋণ আছে হয়তো শোধ করতে পারব না। হয়তো সে (...) কষ্ট পাব বা আল্লাহতাআলার কাছে দায়ী থাকব, যদি পারো মন চায় শোধ করে নিয়ো বা মুক্ত করে দিয়ো। আর কিছু লিখলাম না।

ইতি তোমার স্বামী
গোলাম রহমান
মহৎপুর, খুলনা।

চিঠি লেখক : মুক্তিযোদ্ধা মো. গোলাম রহমান। ঠিকানা : গ্রাম : মহৎপুর, ডাক : ওবায়দুরনগর, উপজেলা : কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা।

চিঠি প্রাপক : স্ত্রী ফজিলা।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : গোলাম রহমানের ছেলে আসলামুজ্জামান।

৭.৭.৭১

শ্রী হেমেন্দ্র দাস পুরকায়স্থ
শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনাদের খবর অনেক দিন পাইনি। বাঁশতলা ক্যাম্প দেখার পর সেই ছেলেদের মুখগুলো সমানেই চোখের ওপর ভাসছে। তাদের মধ্যে যে সাহস, শৃঙ্খলা ও উদ্দীপনা দেখেছি তা আমার জীবনে এক নতুন ইঙ্গিত বয়ে এনেছে। কত লোকের কাছে যে সে কাহিনী বলেছি তা বলার নয়। তাদের কিছু জিনিস দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। কিন্তু শুনছি তারা শিগরিই youth camp-এ চলে আসবে এবং সেখানে তাদের প্রয়োজনীয় সবকিছু সরবরাহ করা হবে। তাই আমাকে সেগুলো জোগাড় করতে মানা করা হলো।

আমি ক্যাম্পের মেয়েদের জন্য কিছু শাড়ি সংগ্রহ করেছি। আপনি প্রয়োজনমতো তা বিলি করার ব্যবস্থা করে দেবেন। কাকিমার জন্য একখানা লালপাড় শাড়ি পাঠালাম—তিনি যেন তা ব্যবহার করেন। বাচ্চাদের জন্য সামান্য কিছু কাপড়-জামা পাঠালাম। অল্প ওষুধ ও ফিনাইল পাঠালাম, আশা করি কাজে লাগবে। আমি সেলা ক্যাম্পে যাবার পর বালাট, ডাউকী, উমলারেম (আমলারেং) প্রভৃতি ক্যাম্পে ঘুরছি।

অবস্থা দুর্দশার চরম সীমায়, খালি মুক্তিবাহিনীর ছেলেরাই অন্ধকারে আশার আলো বয়ে আনে। ভগবান তাদের স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন দিন—এই প্রার্থনা জানাই।

আপনার শরীর কেমন আছে? কাকিমা কেমন আছেন? ক্যাম্পের ও মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা কেমন আছে? আজ এখানেই শেষ করি।

আপনারা আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নেবেন।

ইতি
অঞ্জলি

সংগ্রহ : স্মৃতি ও কথা '৭১ থেকে।

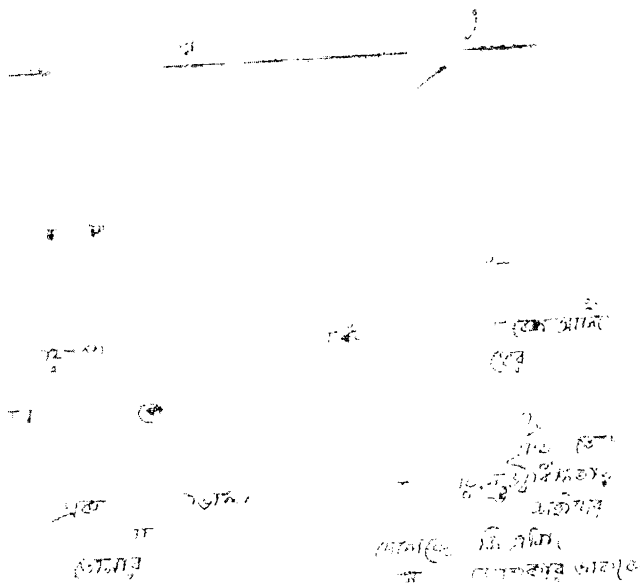

পথের ধারের বাড়ী
১৫ জুলাই, '৭১

মা,

পথ চলতে গিয়ে ক্ষণিকের বিশ্রামস্থল রাস্তার ধারের এ বাড়ি তোমায় চিঠি লিখতে সাহায্য করছে। বাড়ি থেকে আসার পর এই প্রথম তোমায় লিখার সুযোগ পেলাম। এর পূর্বে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও কাগজ, কলম, মন ও সময় একীভূত করতে পারিনি। টিনের চালাঘরে বসে আছি। বাইরে ভীষণ বৃষ্টি হচ্ছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার সর্বত্র। প্রকৃতির একটা চাপা আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে টিনের ওপর বৃষ্টি পড়ার শব্দে শব্দে। মাগো, আজ মনে পড়ছে বিদায়বেলায় তোমার হাসিমুখ। সাদা ধবধবে শাড়িটায় বেশ মানিয়েছিল তোমায়। বর্ষার সকাল। আকাশে খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘের ভেলা ভাসছিল। মেঘের ফাঁকে সেদিনকার পূর্ব দিগন্তের সূর্যটা বেশ লাল মনে হয়েছিল। সেদিন কি মনে হয়েছিল জানো মা, অসংখ্য রক্তবীজের লাল উত্তপ্ত রক্তে ছেয়ে গেছে সূর্যটা। ওর এক একটা কিরণচ্ছটা পৃথিবীতে জন্ম দিয়েছে এক একটি বাঙালি। অগ্নিশপথে বলীয়ান, স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত। মাগো, তোমার কোলে জন্মে আমি গর্বিত। শহীদের রক্ত রাঙা পথে তোমার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছেলেকে তুমি এগিয়ে দিয়েছ। ক্ষণিকের জন্যও তোমার বুক কাঁপেনি, স্নেহের বন্ধন দেশমাতৃকার ডাককে উপেক্ষা করতে পারেনি। বরং তুমিই আমাকে মুক্তিবাহিনীতে যোগদানের জন্য প্রেরণা দিয়েছ। দেশকে ভালোবাসতে শিখিয়েছ। মা, তুমি শুনে খুশি হবে

তোমারই মতো অসংখ্য জননী তাঁদের স্নেহ ও ভালোবাসার সম্পদ পুত্র-সন্তান, স্বামী, আত্মীয়, ঘরবাড়ি সর্বস্ব হারিয়ে শোকে মুহ্যমান হয়নি; বরং ইস্পাতকঠিন মনোবল নিয়ে আজ অগ্নিশপথে বলীয়ান। মাগো, বাংলার প্রতিটি জননী কি তাদের ছেলেকে দেশের তরে দান করতে পারে না? পারে না এ দেশের মা-বোনেরা ছেলে ও ভাইদের পাশে এসে দাঁড়াতে? মা তুমিতো একদিন বলেছিলে, 'সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন এ দেশের মায়ের কোলের শিশুরা মা-বাবার কাছে বিস্কুট-চকলেট চাইবে না জেনো, চাইবে রিভলবার পিস্তল।' সেদিনের আশায় পথ চেয়ে আছে দেশের প্রতিটি সন্তান। যেদিন বাংলার স্বাধীনতা সূর্যে প্রতিফলিত হবে অধিকারবঞ্চিত, শোষিত, নিপীড়িত বুভুক্ষু সাড়ে সাত কোটি জাগ্রত বাঙালির আশা, আকাঙ্ক্ষা। যে মনোবল নিয়ে প্রথম তোমা থেকে বিদায় নিয়েছিলাম তা আজ শতগুণে বেড়ে গেছে, মা। রক্তের প্রবাহে আজ খুনের নেশা টগবগিয়ে ফুটছে। এ শুধু আমার নয়, প্রতিটি বাঙালি পাঞ্জাবি হানাদার লাল কুত্তাদের দেখলে খুনের নেশায় মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। তাই তো বাংলার প্রতিটি আনাচ-কানাচে এক মহাশক্তি ও দুর্জয় শপথে বলীয়ান মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা অনেক বেড়ে গেছে। তোমাদের এ অবুঝ শিশুগুলিই আজ হানাদার বাহিনীকে চরম আঘাত হানছে। পান করছে হানাদার পশুশক্তির রক্ত। ওরা মানুষ হত্যা করে। আমরা পশু (ওদের) হত্যা করছি। এই তো সেদিন বাংলাদেশ ময়মনসিংহ জেলার সদর দক্ষিণ মহকুমার কোনো এক মুক্ত এলাকায় ভালুকাতে (থানা) প্রবেশ করতে গিয়ে হানাদার বাহিনী মুক্তিবাহিনীর বীর যোদ্ধাদের হাতে চরম মার খেয়েছে। মা, তোমার ছোট্ট ছেলে বিপ্লবের হাতেই লেগে আছে বেশ কয়টা পশুর রক্ত। এমনি করে বাংলার প্রতিটি আনাচ-কানাচে মার খাচ্ছে ওরা। মাত্র শুরু। যুদ্ধনীতি ওদের নেই, তাই বাংলার নিরীহ অস্ত্রহীন কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র-শিক্ষক, বৃদ্ধ, শিশু ও নারীর ওপর হত্যাকাণ্ডের মই চালাচ্ছে। এ হত্যাকাণ্ড ভিয়েতনামের একাধিক 'মাইলাইয়ের' হত্যাকাণ্ডকেও ছাড়িয়ে গেছে।

ওরা পশু। পশুত্বের কাহিনী শুনবে, মা? তবে শোনো। শত্রুকবলিত কোনো এক এলাকায় আমার এক ধর্ষিতা বোনকে দেখেছিলাম নিজের চোখে। ডেকেছিলাম বোনকে। সাড়া দেয়নি। সে মৃত। সম্পূর্ণ বিবস্ত্র দেহে পাশবিক অত্যাচারের চিহ্ন শরীরের প্রতিটি ভাঁজে ভাঁজে। বাংলার শিশু ছিল তার গর্ভে। কিন্তু তবু পাঞ্জাবি পশুর হায়না কামদৃষ্টি থেকে সে রেহাই পায়নি। সে মরেছে কিন্তু একটা পশুকেও হত্যা করেছে। গর্বিত, স্তব্ধ, মূঢ় ও কঠিন হয়েছিলাম। আজ অসংখ্য ভাই ও বোনের তাজা রক্তকে সামনে রেখে পথ চলছি আমরা। মাগো, বাংলাদেশে হানাদার বাহিনীর এমন

অত্যাচারের কাহিনী শুনে ও দেখে কি কোনো জননী তার ছেলেকে প্রতিশোধের দীক্ষা না দিয়ে স্নেহের বন্ধনে নিজের কাছে আটকে রাখতে পারে? পারে না। প্রতিটি জননীই আজ তাঁর ছেলেকে দেবে মুক্তিবাহিনীতে, যাতে রক্তের প্রতিশোধ, নারী নির্যাতনের প্রতিশোধ শুধু রক্তেই নেওয়া যায়। মা, আমার ছোট্ট ভাই তীতু ও বোন প্রীতিকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। পারবে না আমাদের তিন ভাই-বোনকে ছেড়ে একা থাকতে? মা, মাগো। দুটি পায়ে পড়ি, মা। তোমার ছেলে ও মেয়েকে দেশ ও জাতির ক্রান্তিলগ্নে ঘরে আটকে রেখো না। ছেড়ে দাও স্বাধীনতার উত্তপ্ত রক্তপথে। শহীদ হবে, অমর হবে, গাজী হয়ে তোমারই কোলে ফিরে আসবে, মা। মাগো, জয়ী আমরা হবই। দোয়া রেখো।

জয় বাংলা ॥

ইতি

তোমারই 'বিপ্লব'

চিঠি লেখক : মুক্তিযোদ্ধা বিপ্লব। চিঠি লেখকের পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি। মুক্তিযুদ্ধকালে এই চিঠি ময়মনসিংহের ভালুকা থেকে প্রকাশিত জাগ্রত বাংলায় প্রকাশিত হয়।

চিঠি প্রাপক : মা। তাঁর পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : ডা. মো. শফিকুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক, চক্ষুবিজ্ঞান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

১৬.৭.১৯৭১

মা,

মুক্তিসেনাদের ক্যাম্প থেকে লিখছি। এখন বাইরে বেশ বৃষ্টি হচ্ছে। তাঁবুর ফাঁক দিয়ে দেখতে পাচ্ছি সমস্ত দিগন্ত মেঘলা মেঘলা। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে কিনা, তাই মনটা ভালো না। আচ্ছা মা, সারা রাত এমনি চলার পর পূর্বাকাশে যে লাল সূর্য ওঠে, তার কাঁচা আলো খুব উজ্জ্বল হয়, তাই না? এই মুহূর্তে আমার ছোটবেলার কথা মনে পড়ছে। বর্ষা এলে তুমি বাইরে যেতে দিতে না, একদিন তোমার অজান্তে বাইরে আসতেই পিছলে পড়ে পায়ে চোট লাগে। তখন তুমি চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিলে। ওষুধ দিয়ে ভর্তি হয়েছিল টেবিলটা, আমার বেশ মনে আছে। তখন থেকে একা বাইরে যেতে সাহস পেতাম না, ভয় লাগত। বাইরে গেলেই পড়ে যাব। কিন্তু আজ! আজ আমার অনেক সাহস হয়েছে, রাইফেল ধরতে শিখেছি। বাংকারে রাতের পর রাত কাটাতে হচ্ছে তবুও ভয় পাই না। শত্রুর আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণে শিরায়-উপশিরায় রক্তের চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। মা, সত্যিই তোমাকে বোঝাতে পারব না। ছোটবেলার কথা মনে পড়লে কেমন যেন লাগে। কিন্তু আমার একি আশ্চর্য পরিবর্তন, কারণ আমি আমার স্বদেশ, আমার বাংলাকে ভালোবাসি।

মা, কৈশোরে একদিন আব্বা আমাকে সৈয়দপুরে নিয়ে গিয়েছিল, স্পেশাল ট্রেন দেখাতে। সেখান থেকে আমি হারিয়ে যাই। তখন একলা একলা অনেকক্ষণ ঘুরেছিলাম। ধীরে ধীরে সন্ধ্যার ঘনঘটা নেমে আসছিল, আমার কেমন যেন কান্না পাচ্ছিল। মনে হয়েছিল আমি হারিয়ে গেছি। তখন মনে হয়েছিল আর কোনো দিনই হয়তো তোমার কাছে ফিরে যেতে পারব না। তখন কাঁদতে কাঁদতে স্টেশনের দিকে আসতে শুরু করেছিলাম। রাস্তায়

হাজারী বেলপুকুরের হাই-ই আমাকে বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল। দেখি, সেখানে কিছুক্ষণ পরে আব্বা গেলেন। পরের দিন এসে সমস্ত কথা শুনতে না শুনতেই আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে তুমি কাঁদছিলে। অথচ সেদিন তুমি তো কাঁদলে না মা! আমি রণাঙ্গনে চলে এলাম। গুলি, শেল, মর্টার নিয়ে আমার জীবন। ইয়াহিয়ার জঘন্যতম অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য দুর্জয় শপথ নিলাম। এখন বাংকারে বাংকারে বিনিদ্র রজনী কাটাতে হয়। কখনোবা রাতের অন্ধকারে শত্রুর ঘাঁটির ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালাই। এ যুদ্ধ ন্যায়ের যুদ্ধ। মা, আমাদের জয় হবেই হবে।

মাগো, সেদিনের সন্ধ্যাটাকে আমার বেশ মনে পড়ছে। আজকের মতো মেঘলা মেঘলা আকাশ সেদিন ছিল না। সমস্ত আকাশটা তারায় ভর্তি ছিল। তুমি রান্নাঘরে বসে তরকারি কুটছিলে।

আমি তোমাকে বললাম—মা, আমি চলে যাচ্ছি। তুমি মুখের দিকে তাকালে। আমি বলেছিলাম, 'মা, আমি মুক্তিবাহিনীতে চলে যাচ্ছি।' উনুনের আলোতে তোমার মুখটা স্পষ্ট দেখতে পেলাম। তোমার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তুমি দাঁড়িয়ে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে তাকালে। আমার ঘরের পেছনে বেলগাছটার কিছু পাতা বাতাসে দোল খেয়ে আবার স্থির হয়ে গেল। মা, সেদিন সন্ধ্যাতেই তুমি আমাকে হাসিমুখে বিদায় দিয়েছিলে। মা, মনে হচ্ছে কত যুগ পেরিয়ে গেছে, এক একটি দিন ইতিহাসের পাতার মতো রয়ে গেছে। কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা অন্যায়ের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কিন্তু মা, দিনান্তের ক্লান্তিতে নিত্যকার মতো সেই সন্ধ্যাটা আবার আসবে তো?

ইতি

তোমার স্নেহের

ববিন

চিঠি লেখক : মুক্তিযোদ্ধা মো. আব্দুর রউফ ববিন (সেক্টর ৬, কোম্পানি সি, গ্রুপ এফএফ, বডি নং ৩/৩৬)

চিঠি প্রাপক : মা মোছা. রফিয়া খাতুন।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : তোতন সাহা ও সাজু, সাহাপাড়া, ডোমার, নীলফামারী।

২৭ আষাঢ়, ১৩৭৮

আব্বা,

আমার সালাম ও কদমবুসি গ্রহণ করুন। জীবনের যত অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন। আমি আজ চলে যাচ্ছি, জানি না আর ফিরে আসব কি না। যদি ফিরে আসতে পারি তাহলে দেখা হবে। আল্লাহর কাছে দোয়া করেন, যেন আপনার ছেলে এ দেশের মুক্তিসংগ্রামে গাজী হতে পারে। আমি জীবনে কোনো দিন আপনাদের সুখ দিতে পারি নাই। জানি না দিতে পারব কি না। দোয়া রাখবেন। আপনার থেকে যে টাকা নিচ্ছি, মামার কাছ থেকে এনে মহাজনকে দিবেন। আর মামাকে তার চিঠিটা দিবেন। মায়ের প্রতি নজর দিবেন। আমি জানি, আমি চলে যাবার পর মায়ের মাথা আরও খারাপ হবে। কিন্তু এ ছাড়া আমার পথ নেই। তার প্রতি নজর রাখবেন। সাইয়েদকে হাতে হাতে রাখবেন। বুবুকে আমার সালাম দিবেন। আমি যাচ্ছি কলকাতার পথে। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবেন, বরিশাল গেছে। আর আমার সব অপরাধ ক্ষমা করে আল্লাহর কাছে দোয়া করেন যেন সহিসালামতে আবার ফিরে আসতে পারি। কাকুকে আমার সালাম দিবেন এবং বাড়ির সকলকে। শেষ করি, আব্বা।

ইতি

আপনার স্নেহের টুকরো

হক

চিঠি লেখক : মুক্তিযোদ্ধা হক। পুরো নাম আজিজুল হক।

চিঠি প্রাপক : বাবা হামিজউদ্দিন হাওলাদার, গ্রাম : আ-কলম, থানা : স্বরূপকাঠি, জেলা : পিরোজপুর।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : মুক্তিযোদ্ধার ছোট ভাই মো. শাহরিয়ার কবীর, সহকারী অধ্যাপক, ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ (ইউডা), রোড-২৫, বাড়ি ৩০১, ধানমন্ডি, ঢাকা।

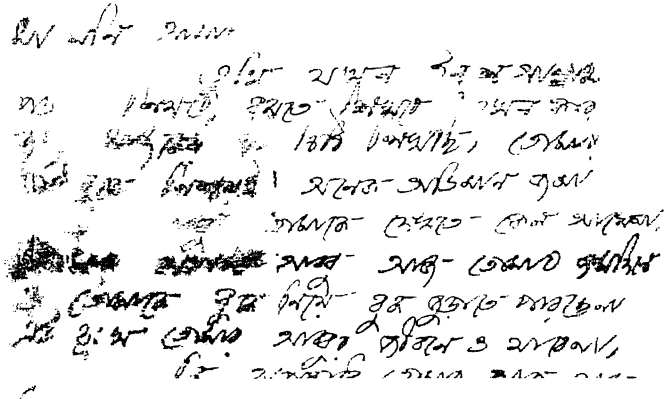

১৬ জুলাই, ১৯৭১ ইং

মামণি আমার,

তুমি যখন ইনশাল্লাহ পড়তে শিখবে, বুঝতে শিখবে, তখনকার জন্য আজকের এই চিঠি লিখছি। তোমার ছোট্ট বুকে নিশ্চয়ই অনেক অভিমান জমা (...) আব্বু তোমাকে দেখতে কেন আসে না। মা আমার, আব্বু আজ তোমার জন্মদিনে তোমাকে বুকে নিয়ে বুক জুড়াতে পারছে না এই দুঃখ তোমার আব্বুর জীবনেও যাবে না। কী অপরাধে তোমার আব্বু আজ তোমার কাছে আসতে পারে না। তোমাকে কোলে নিয়ে আদর করতে পারে না, তা তুমি বড় হয়ে হয়তো বুঝবে, মা। কারণ আজকের অপরাধ তখন অপরাধ বলে গণ্য হবে না। আজকে এ দেশের জনসাধারণ তোমার আব্বুর মতোই অপরাধী, কারণ তারা নিজেদের অধিকার চেয়েছিল। অপরাধী দেশবরেণ্য নেতা, অপরাধী লেখক, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক—এ দেশের সব বুদ্ধিজীবী, কারণ তারা এ দেশকে ভালোবাসে। হানাদারদের কাছে, শোষকদের কাছে এর চেয়ে বড় অপরাধ আর কিছুই নেই। এই অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। সেই দণ্ড এড়াবার জন্য লাখ লাখ লোক দেশ ত্যাগ করেছে। সেই দণ্ড এড়াবার জন্য তোমার আব্বুকে গ্রামে গ্রামে, পাহাড়ে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। তাই আজ বুক ফেটে গেলেও আব্বু এসে তোমাকে কোলে নিয়ে আদর করতে পারছে না। মনের মণিকোঠায় তোমার সে ছোট্ট মুখখানি সব সময় ভাসে, কল্পনায় তাকে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিই। আর তাতেই তোমার আব্বুকে সান্ত্বনা পেতে হয়।

আম্মু, নামাজ পড়ে প্রত্যেক ওয়াক্তে তোমার জন্য দোয়া করি। আল্লাহ রহমানুর রাহিমের কাছে মোনাজাত করি তিনি যেন তোমার আম্মুকে আর তোমাকে সুস্থ রাখেন, বিপদমুক্ত রাখেন।

মামণি, তোমার আম্মু লিখেছে তুমি নাকি এখন কথা বল। তুমি নাকি বল, আব্বু জয় বাংলা গাইত। ইনশাল্লাহ সেই দিন বেশি দূরে নয় আব্বু আবার তোমাকে জয়বাংলা গেয়ে শোনাবে। যদি আব্বু না থাকি তোমার আম্মু সেদিন তোমাকে জয়বাংলা গেয়ে শোনাবে। তোমার আম্মু আরও লিখেছে, তুমি নাকি তোমাকে পিট্টি লাগালে আম্মুকে বের করে দেবে বলে ভয় দেখাও। তোমার আম্মু না ভীষণ বোকা। খালি তোমার আর আমার জন্য কষ্ট করে। বের করে দিলে দেখো আবার ঠিক ঠিক ফিরে আসবে। আমাদের ছেড়ে থাকতে পারবে না।

তোমার আম্মু দুঃখ পেলে এখন আর কাউকে বলবে না। একা একা শুধু কাঁদবে। তুমি আদর করে আম্মুকে সান্ত্বনা দিও, কেমন? তুমি আমার অনেক অনেক চুমো নিও।

ইতি

আব্বু

চিঠি লেখক : আতাউর রহমান খান কায়সার। রাজনীতিবিদ, চট্টগ্রাম।
চিঠি প্রাপক : মেয়ে ওয়াসেকা এ খান। ৭ আয়েশা খাতুন লেইন, বংশালবাড়ি, চন্দনপুরা, চট্টগ্রাম।
চিঠিটি পাঠিয়েছেন : ওয়াসেকা এ খান।

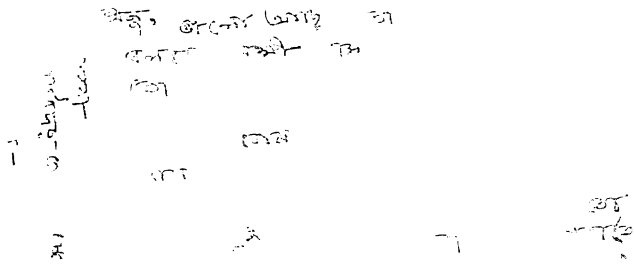

২০.৭.১৯৭১

অনু,

ভালো আছি। তোমার মনের বাঁধ ভেঙে গেলে বলব, লক্ষ্মী আমার, মানিক আমার, চিন্তা করো না। তোমার নয়ন কুশলেই আছে। বিধাতার অপার করুণা। যখন আমায় বেশি করে মনে পড়বে তখন এই ভেবেই মনকে বোঝাবে, এই বলেই বিধাতার কাছে প্রার্থনা জানাবে—শুভ কাজে অনড় থেকে শুভ সমাধা করে যেন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরতে পারি। ফিরতে পারি মায়ের বুকে—মুছিয়ে দিতে মায়ের এত কান্নাকে। নতুন দিনের আলোয় ভরা উজ্জ্বল প্রভাতে গিয়ে যেন মাকে মা বলে ডাকতে পারি। দোয়া করো। তোমরা সবাই নামাজ পড়ো। তোমার মনের দৃঢ় প্রত্যয় আমায় জোগাবে এগিয়ে চলার শাশ্বত মনোবল। আমি এ বলে বলীয়ান হয়ে অন্যায়কে পদদলিত করতে জানব, সত্যকে আঁকড়ে ধরতে পারব বেশি করে। এবং এ পারাই আমায় এগিয়ে নিয়ে যাবে শেষ লক্ষ্যস্থলে, যেখানে ভবিষ্যৎ বংশধরেরা হাসতে পারবে—কথা বলতে পারবে—বাঁচার মতো বাঁচতে পারবে নিজ শক্তিতে শক্তিমান হয়ে।

পাহাড়ের শ্যামল বনরাজির এ মেলায় প্রায় প্রতিদিন বর্ষা নামে চারদিক অন্ধকার করে। বর্ষার অশান্ত বর্ষণে পাহাড়ি ঝরনায় তখন মাতন নেমে আসে। দুর্বার বেগে ঝরনার সে জলধারা কলকল গান করে এগিয়ে চলে সমতলের দিকে। আমার মনের সবটুকু মাধুরী ঢেলে তখন সে ধারাকে কানে কানে বলি—ওগো ঝরনার ধারা, তুমি সমতলের দেশে গিয়ে আমার অনুকে আমার এ বারতা বলে দিয়ো, 'ওকে আমার একান্ত কাছে পাই যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে। নিকষ কালো অন্ধকারের একাকিত্ব তখন আর থাকে না। মনের আলোয় আমি সবকিছু দেখতে পাই। দূরকে দূর মনে হয় না। একাকার হয়ে যায়। ওগো ঝরনার ধারা, তুমি অনুকে এও বলো—তোমার

নয়ন তোমার কথা ভাবে—মনের প্রশান্তিতে ভরিয়ে আনতে তাকে সাহায্য করে সব দিক দিয়ে।' তুমি ওকে বলো—মিছে মিছে আমার অনু যেন মন খারাপ করে না থাকে। ওর হাসিখুশি মন ও আত্মশক্তিই তো আমার প্রেরণার উৎস।

আচ্ছা, সত্যি করে বল তো লক্ষ্মী, তুমি কি গোমরা মুখ করে সারা দিন ঘরের কোণে একাকী বসে বসে কাটাও? না, এ চিঠি পাবার পর থেকে তা করো না। আমি কিন্তু টের পেয়ে যাব। তিন সত্যি করে বলছি—দেশে গিয়ে তোমার সে-ই কিচ্ছাটা সুন্দর করে শোনাব। না, না, মিথ্যে বলছি না। অবশ্য আগে বলতাম। বিশ্বাস করো আগের আমি আর এখনকার আমি অনেক তফাত। এখনকার আমি ভবিষ্যৎ বংশধরের প্রাথমিক সোপান।

তোমার শরীরে পরিবর্তন এসেছে অনেকটা বোধহয়। নিজের প্রতি বিশেষ যত্নবান হয়ো। মনকে প্রফুল্ল রেখো। মনের প্রফুল্লতা ভবিষ্যৎকে সুন্দর করবে। প্রয়োজনবোধে ঔষধ সেবন করো। সাবধানে থেকো। বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেয়ো না। আম্মাকেও কোথাও যেতে দিয়ো না। বুঝি, আমার কথা তুমি একটু বেশি করেই ভাব। সত্যি বলছি, ভাববার কিছুই নেই। আজ আমি ধন্য এই জন্য যে আমি আমার দেশকে ভালোবাসতে শিখেছি। আমার এ শিক্ষা কোনো দিন বিফলে যাবে না। তোমার সন্তানেরা একদিন বুক উঁচু করে তাদের বাবার নাম উচ্চারণ করতে পারবে। তুমি হবে এমন সন্তানের জননী, যে সন্তান মানুষ হবে, মানুষকে মানুষ বলে ভাবতে জানবে। এবং এ মানুষ হওয়া সম্পূর্ণ নির্ভর করবে তোমার ওপর। কেবলমাত্র আত্মশক্তিতে বলীয়ান মা-ই তেমন সন্তান দেশকে দিতে পারে। আশা করি তুমি সেই আদর্শ জননীর ভূমিকাই পালন করে যাবে—কাজে, কথায়, চিন্তায়।

মার সাথে দেখা করে আসতে পারিনি। পারিনি আজ পর্যন্ত সন্তানের কর্তব্য পালন করতে। আমার অবর্তমানে তাঁকে দেখার ভার তোমার ওপর রইল। সন্তান হয়ে যা করতে পারিনি, বধূ হয়ে তোমায় তা করতে হবে।

পরিশেষে বলব, যাত্রা সবে শুরু হলো। পথ এখনো অনেক বাকি। পথের দুর্গমতা দেখে থমকে দাঁড়ালে চলবে না। এগিয়ে যেতে হবে দৃঢ় পদক্ষেপে, সকল বাধাকে দলিতমথিত করে। এর জন্য চাই অটুট মনোবল। সে মনোবলের অধিকারিণী হয়ে ভবিষ্যৎ বংশধরদের মানুষ করে গড়ে তোলো।

গকুলনগর থাকতে কি মজার ব্যাপার হয়েছিল তা অনেক দিন পর হলেও লিখে আজকের লেখার ইতি টানব। কী কারণে যেন সেদিন সারা বেলা উপোস থাকতে হয়েছিল। খাওয়া আর হয়ে ওঠেনি। সকালবেলাতেও না—রাতেও না। একেবারে কিছু না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুমিয়ে

পড়েও কিন্তু ঘুমিয়ে থাকতে পারিনি।
তুমি এসে ঘুমের বারটা বাজিয়ে হরেক রকমের এত খানা খাইয়ে দিয়েছ যে আর খেতে পারি না বলে তোমার হাত চেপে ধরে যেই দুষ্টুমী করতে গিয়েছি, অমনি ঘুম ভেঙে গেল। নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে দেখি আমি বাড়িতে শুয়ে নেই। সুউচ্চ পাহাড়ের মালভূমিতে তাঁবুর এক কোণ ঘেঁষে আমার ব্যাগটার (যেটা বালিশের কাজ দিচ্ছিল) হ্যান্ডেল ধরে ওপরের দিকে চেয়ে আছি। তাঁবুর সামনের পর্দা সরিয়ে দেখি ভোর হতে আর দেরি নেই।... সেই যে একদিন এলে—এরপর আর আসনি। এলেই তো পারো! এবার কিন্তু ইতি টানব না—শুধু বলব—নিচে একটা ধাঁধা দিলাম, মাথা ঘামিয়ে ভেঙে দাও। ভাঙতে পারলে জানতে পারবে আমি কোথায় আছি।
ধাঁধা
তিন অক্ষরে নাম আমার হই দেশের নাম
মধ্যের অক্ষর বাদ দিলে গাছেতে চড়লাম
শেষের অক্ষর বাদ দিলে কাছে যেতে কয়
বলো তো অনু, আমি রয়েছি কোথায়?
আব্বা-আম্মাকে সালাম দিয়ে দোয়া করতে বলো। ছোটদের স্নেহাশিস জানিয়ো। তুমি নিয়ো সহস্র চুমো—অ-নে-ক আদর।
তোমার নয়ন

চিঠি লেখক : মুক্তিযোদ্ধা পাটোয়ারি নেসারউদ্দিন (নয়ন)।

চিঠি প্রাপক : স্ত্রী ফাতেমা বেগম (অনু), গ্রাম : মৈশাদী, ইউনিয়ন : তরপুরচণ্ডী, থানা ও জেলা : চাঁদপুর। বর্তমান ঠিকানা : চ ২৭/৭ স্কুল রোড, চতুর্থ তলা, ওয়্যারলেস গেট, মহাখালী, ঢাকা।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : ফাতেমা বেগম (অনু)।

২১ জুলাই ১৯৭১

মা,

সর্বপ্রথম আমার সালাম ও কদমবুসি গ্রহণ করবেন। পর সমাচার এই যে আমি আজ এমন এক স্থানে রওয়ানা হলাম, যেখানে মিলিটারির কোনো হামলা নেই। তাই আজ আপনার কাছে লিখতে বাধ্য হলাম। আমার সমস্ত দোষ। তাই আপনি আমার অন্যায় বলতে যা কিছু আছে, সমস্ত ক্ষমা করে দিবেন। আমার প্রতি কোনো দাবি রাখবেন না। কারণ আমার মৃত্যু যদি এসে থাকে, তবে আপনারা আমায় বেঁধে রাখতে পারবেন না। মৃত্যুর সঙ্গে আমাদের সংগ্রাম করতে হবে। মৃত্যুর জন্য আমি সব সময় প্রস্তুত। গ্রামে বসে শিয়াল-কুকুরের মতো মরার চেয়ে যোদ্ধাবেশে আমি মরতে চাই। মরণ একদিন আছে। আজ যদি আমার মরণ আসে, তাহলে আমাকে আপনারা মরণ থেকে ফিরাতে পারবেন না। মরণকে বরণ করে আমার যাত্রা শুরু করলাম। আমার জন্য দুঃখ করবেন না। মনে করবেন, আমি মরে গেছি। দোয়া করবেন, আমি যাতে আমার গন্তব্যস্থানে ভালোভাবে পৌঁছাতে পারি। আব্বাকে আমার জন্য দোয়া করতে বলবেন। সে যেন আমার সমস্ত অন্যায়কে ক্ষমা করে দেয়। নামাজ পড়ে আমার জন্য দোয়া করবেন। আপনার ছেলে যদি হয়ে থাকি, তবে আমার জন্য দুঃখ করবেন না। বাড়ির সবার কাছ থেকে আমার দাবি ছাড়াবেন। খোদায় যদি বাঁচায়, তবে আমি কয়েক দিনের ভেতর ফিরে আসব। ইনশাল্লাহ খোদা আমাদের সহায় আছেন। মিয়াভাইয়ের কাছে আমার সালাম ও দোয়া করতে বলবেন। আর আমার জন্য কোনো খোঁজ বা কারও ওপর দোষারোপ করবেন না। এটা আমার নিজের ইচ্ছায় গেলাম। আমি টাকা কোথায় পেলাম সে কথা জানতে চাইলে আমি বলব, বাবুলের মায়ের ট্রাংক থেকে

আমি ৬০ টাকা নিলাম এবং তার টাকা আমি বাঁচলে কয়েক দিনের ভেতর দিয়ে দেব। বাবুলের মায়ের টাকার কথা কারও কাছে বলবেন না। আর বাবুলের মাকে বলবেন, সে যেন কয়েকটা দিন অপেক্ষা করে। জানি, আমাকে দিয়ে আপনাদের সমস্ত আশা-ভরসা করছেন। কিন্তু আমার ছোট ভাই দুইটাকে দিয়ে সে সমস্ত আশা সফল করতে চেষ্টা করবেন। দাদা ও মুনিরকে মানুষ করে ওদের দ্বারা আপনারা সমস্ত আশা বাস্তবরূপে ধারণ করবেন। আমাদের এ যাত্রা মহান যাত্রা। আমরা ভালোর জন্য এরূপ যাত্রা করলাম। অতি দুঃখের পর এ দেশ থেকে চলে গেলাম। দোয়া করবেন। খোদা হাফেজ।

ইতি

আপনার হতভাগা ছেলে

আমি

চিঠি লেখক : মুক্তিযোদ্ধা দুদু মিয়া। তাঁর পুরো নাম আবু বকর সিদ্দিক, পিতা মৃত : আবুল হোসেন তালুকদার। ঠিকানা : গ্রাম : নরসিংহলপট্টি, ডাকঘর শাওড়া, উপজেলা : গৌরনদী, জেলা : বরিশাল।

চিঠি প্রাপক : মা আনোয়ারা বেগম।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : লেখক নিজেই।

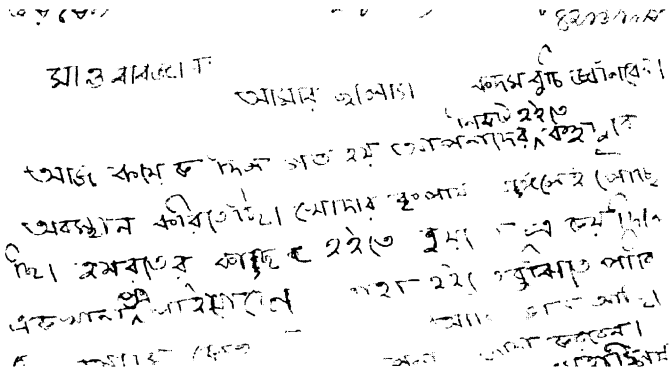

২৩/৭/১৯৭১, শুক্রবার

১.

মা ও বাবজান,

আমার সালাম ও কদমবুসি জানিবেন। আজ কয়েকদিন গত হয় আপনাদের নিকট হইতে বহুদূরে অবস্থান করিতেছি। খোদার কৃপায় মঙ্গলেই পৌঁছিয়াছি। হযরতের কাছ হইতে হয়তো এ কয়দিনে একখানা পত্র পাইয়াছেন। তাহা হইতেই বুঝিতে পারিয়াছেন আমি কোথায় আছি। আমি ভালো আছি। আমার জন্য সবাইকে ও আপনারা দোয়া করিবেন। শ্রেণীগতভাবে সবাইকে আমার সালাম ও স্নেহাশিস দিবেন। নানা অসুবিধার জন্য খোলাখুলি সবকিছু লিখিতে পারিলাম না।

ইতি : হাকিম

N.B : হয়তো মাস দুই পরে বাড়ি ফিরিব। আবার তা নাও হইতে পারে।

২.

শ্রদ্ধেয় মামাজান,

আমার ভক্তিপূর্ণ সালাম ও কদমবুসি গ্রহণ করিবেন। আশা করি ভালো আছেন। আমরা আপনাদের দোয়ায় ভালোই আছি। আমার জন্য কোনোরূপ চিন্তা করিবেন না। দোয়া করিবেন যেন ভালোভাবে আপনাদের নিকট ফিরিয়া যাইতে পারি ও উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে পারি। অধিক কি আর লিখিব। আমাদের বাড়িতে সংবাদ দিবেন।

ইতি

আপনার স্নেহের মতি

একই কাগজে পাঁচজন মুক্তিযোদ্ধা চিঠি লিখেছেন। তাঁদের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা মতি শহীদ হন। তাঁরা চিঠিগুলো লিখেছেন পশ্চিমবঙ্গের করিমগঞ্জ স্টেশনের নিকটবর্তী কেচুয়াডাঙ্গা হাইস্কুলে ট্রানজিট সেন্টারে অবস্থানকালে। পত্র লেখকদের নাম : হাকিম, হাশমত, হাসু, মতি ও মোতালেব। এখানে হাকিম ও মতির চিঠি প্রকাশিত হলো।

চিঠি প্রাপক : মো : শামসুল আলম, প্রযত্নে : মৌলভী সেহাবউদ্দিন, গ্রাম : নলসন্দা, পো : ডিগ্রীর চর, উল্লাপাড়া, পাবনা (বর্তমানে সিরাজগঞ্জ জেলা)।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : মো. শামসুল আলম। তিনি বর্তমানে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের দিনাজপুর দক্ষিণের উপমহাব্যবস্থাপক।

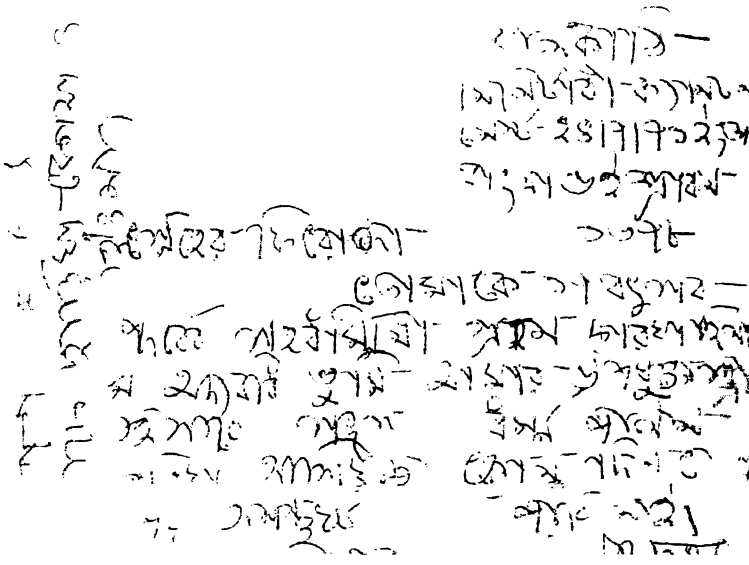

ঝালকাঠি, মিলিটারি ক্যান্টনমেন্ট
২৪/৭/৭১, বাংলা ৬ শ্রাবণ, ১৩৭৮

স্নেহের ফিরোজা,

তোমাকে ১৭ বৎসর পূর্বে সহধর্মিণী গ্রহণ করিয়াছিলাম। অদ্যাবধি তুমি আমার উপযুক্ত স্ত্রী হিসাবে সংসারধর্ম পালন করিয়া আসিয়াছ। কোনো দিন তোমার উপর অসন্তুষ্ট হইতে পারি নাই। আজ আমি (...) তোমাদের অকূল সাগরে ভাসাইয়া পরপারে চলিয়াছি। বীরের মতো সালাম— ইনশাল্লাহ জয় আমাদের হইবে, দুনিয়া হইতে লাখ লাখ লোক চলিয়া গেছে খোদার কাছে। কামনা করি যেন সব শহীদদের কাতারে শামিল হইতে পারি। মনে আমার কোনো দুঃখ নাই। তবে বুক জোড়া কেবল আমার বাদল। ওকে মানুষ করিয়ো। আজ যে অপরাধে আমার মৃত্যু হইতেছে খোদাকে সাক্ষী রাখিয়া আমি বলিতে পারি যে এই সব অপরাধ হইতে আমি নিষ্পাপ। জানি না খোদায় কেন যে আমাকে এরূপ করিল। জীবনের অর্ধেক বয়স চলিয়া গিয়াছে, বাকি জীবনটা বাদল ও হাকিমকে নিয়া কাটাইবে। (...) পারিলাম না। (...) বজলু ভাইয়ের বেটা ওহাবের কাছে ১৫ হাজার টাকা আছে। যদি প্রয়োজন মনে কর তবে সেখান হইতে নিয়া নিয়ো।

ইতি

তোমারই

বাদশা

(বাবা হাকিম, তোমার মাকে ছাড়িয়া কোথাও যাইয়ো না)

চিঠি লেখক : শহীদ বাদশা মিয়া তালুকদার, গ্রাম : বাঁশবাড়িয়া, উপজেলা : টুঙ্গিপাড়া, জেলা : গোপালগঞ্জ।

চিঠি প্রাপক : স্ত্রী ফিরোজা বেগম।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : মো : বাদল তালুকদার। ১/২ ব্লক জি, লালমাটিয়া, ঢাকা।

২৯.৭.৭১
বয়ড়া

নীলু,

নাসিরের হাতে পাঠানো চিঠি কাল পেয়েছি ও আজ পোস্টের চিঠিটা পেলাম। খোকন যাবার পর মনসুর থাকাতে তবুও সময় চলে গেছে। সেদিন ও চলে যাবার পর এখন একদম Lonely লাগছে, তবে গত ৩-৪ দিন খুব ব্যস্ত ছিলাম। তাই সময় কেটে গেছে। গতকাল ভোর রাত্রে ছোটিপুর (...) আক্রমণ করেছিলাম ও দারুণ যুদ্ধ হয়েছে। গুলি ফুরিয়ে যাওয়াতে আমরা পিছে চলে আসতে বাধ্য হই। আমরা মাত্র ৪০ জন আর ওরা ১৫০-র মতো ছিল। কিন্তু আক্রমণে টিকতে না পেরে বহু পালিয়ে যায়। আমরা শেষ পর্যন্ত ওদের শেষ Defence-এর দেড় শ গজের মধ্যে চলে যেতে পেরেছিলাম। আমরা আর আধা ঘণ্টা টিকতে পারলে দখল করতে পারতাম। কারণ, আজ জানলাম ওরা নৌকা তিনটা করে পালিয়ে যেতে জোগাড় করেছিল। ওদেরও গুলি শেষ হয়ে এসেছিল। ভোর ৪-২০ থেকে ৭-৪৫ পর্যন্ত যুদ্ধ চলে। ওদের বারজন মারা গেছে ও বহু আহত হয়েছে। আমাদের তরফে একজনের হাতে গুলি লাগে—হাসপাতালে আছে। Col কাপুর General-কে আমার এই যুদ্ধ সম্বন্ধে একটা দারুণ ফুলে যাওয়ার মতো Report দিয়েছে।

খোকনকে বলো ইনশাল্লাহ আগামীকাল রাত্রে আমরা সেই Operationটা করব, যেটা সেদিন রওনা হবার সময় Cancel করি।

আজ Radio-তে (Daily) *Telegraph*-এ Peter Bill-এর আমার ও আমার মুক্ত এলাকার Report শুনে খুব খুশি লেগেছে। আজ বাংলাদেশ মিশন থেকে আমাকে জানিয়েছে যে Peter Bill নাকি এই প্রথমবার আমাদের সম্বন্ধে একটা Favorable report দিল। আরও শুনলাম *Time*-এ বেরিয়েছে।

এসবের Copy-গুলো জোগাড় করো। মওদুদকে বলো, Daily *Mirror*-এ কিছুদিন আগে আমার এলাকা সম্বন্ধে যে Report বেরিয়েছিল, সেটা যেন অবশ্যই দেয় ও অন্য যাদের নিয়েছিল সেগুলোও দেয়।
তুমি শুনে খুশি হবে যে সেদিন জিওসির Conference-এ জানলাম যে আমার Coy (Company) শত্রু ধ্বংস করার Record-এ সমস্ত পশ্চিম রণাঙ্গনে প্রথম স্থানে ও আমার Coy-কে Best বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। আগামীকাল Indian film division আমার এলাকার Movie তুলতে আসবে।
এত সব হওয়া সত্ত্বেও ভীষণ একা লাগছে এবং কেমন যেন অসহ্য লাগছে। Physically ও Mentally completely tired সব সময়। সবকিছু ছেড়ে চলে আসতে ইচ্ছা করে, কিন্তু তখনই বিবেকের কাছে ভীষণ অপরাধী মনে হয়। আজ তো প্রায় French leave-এ চলে আসছিলাম। সকালে গিয়ে বিকেলে চলে আসা, কিন্তু পরে আবার বিবেকের তাড়নায় ইচ্ছা ছাড়লাম।

ইত্তু ও নাহীদ মনিরা কেমন আছে? ওদের আমার অনেক আদর দিয়ো। বরিশালের আর নতুন কোনো খবর পেলে কি না জানাবে। লোক পেলে আমি লিখব।
আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছ। আব্বা-আম্মা ও আপাকে আমার সালাম দিয়ো। খোকন ও খুশনুদকে ভালোবাসা দিয়ো।
জলদি উত্তর দিয়ো।
ইতি
গুড়ু

চিঠি লেখক : মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল খন্দকার নাজমুল হুদা। সাব সেক্টর কমান্ডার। লিখেছেন বয়ড়া থেকে। তিনি ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর নিহত হন।

চিঠি প্রাপক : স্ত্রী নীলুফার দিল আফরোজ বানু। ১৯৭১ সালে তিনি কলকাতায় ছিলেন। তাঁর বর্তমান ঠিকানা : ১৫৯ ইস্টার্ন রোড, লেন ৩, নতুন ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : নীলুফার দিল আফরোজ বানু।

টেকেরহাট থেকে, ৩০.৭.৭১ ইং

প্রিয় আব্বাজান,

আমার সালাম নিবেন। আশা করি খোদার কৃপায় ভালোই আছেন। বাড়ির সকলের কাছে আমার শ্রেণীমতো সালাম ও স্নেহ রইল। বর্তমানে যুদ্ধে আছি আলী রাজা, রওশন, সাত্তার, রেনু, ইব্রাহিম, ফুল মিয়া। সকলেই একত্রে আছি। দেশের জন্য আমরা সকলেই জান কোরবান করেছি। আমাদের জন্য ও দেশ স্বাধীন হওয়ার জন্য দোয়া করবেন। আমি জীবনকে তুচ্ছ মনে করি। কারণ দেশ স্বাধীন না হলে জীবনের কোনো মূল্য থাকবে না। তাই যুদ্ধকেই জীবনের পাথেয় হিসেবে নিলাম। আমার অনুপস্থিতিতে মাকে কষ্ট দিলে আমি আপনাদেরকে ক্ষমা করব না। পাগলের সব জ্বালা সহ্য করতে হবে। চাচা-মামাদের ও বড় ভাইদের নিকট আমার সালাম। বড় ভাইকে চাকুরীতে যোগ দিতে নিষেধ করবেন। জীবনের চেয়ে চাকুরি বড় নয়। দাদুকে দোয়া করতে বলবেন। মৃত্যুর মুখে আছি। যেকোনো সময় মৃত্যু হতে পারে এবং মৃত্যুর জন্য সর্বদা প্রস্তুত। দোয়া করবেন মৃত্যু হলেও যেন দেশ স্বাধীন হয়। তখন দেখবেন লাখ লাখ ছেলে বাংলার বুকে পুত্রহারাকে বাবা বলে ডাকবে। এই ডাকের অপেক্ষায় থাকুন।

আর আমার জন্য চিন্তার কোনো কারণ নাই। আপনার দুই মেয়েকে পুরুষের মতো শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলবেন। তবেই আপনার সকল সাধ মিটে যাবে। দেশবাসী, স্বাধীন বাংলা কায়েমের জন্য দোয়া করো, মীরজাফরী করো না। কারণ মুক্তিফৌজ তোমাদের ক্ষমা করবে না এবং বাংলায় তোমাদের জায়গা দেবে না।

সালাম, দেশবাসী সালাম।

ইতি

মো. সিরাজুল ইসলাম

১৯৭১ সালের ৮ আগস্ট ৫ নম্বর সেক্টরের বড়ছড়া সাবসেক্টরের সাচনা জামালগঞ্জে পাকিস্তান বাহিনীর সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর ব্যাপক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। বীর যোদ্ধা সিরাজুল ইসলাম একটিমাত্র প্লাটুন নিয়ে পাকবাহিনীর সুরক্ষিত ঘাঁটি সাচনা আক্রমণ করেন। সুসংগঠিত পাকবাহিনীর আধুনিক অস্ত্রের মুখে মুক্তিযোদ্ধাদের টিকে থাকাই ছিল অসম্ভব। মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে ছিল সীমিত অস্ত্র। এমন পরিস্থিতিতে সাহসী কমান্ডার সিরাজুল ইসলাম সহযোদ্ধাদের আক্রমণ অব্যাহত রাখার নির্দেশ দিয়ে নিজে গ্রেনেড নিয়ে ক্রলিং করে শত্রু বাংকারের দিকে এগিয়ে যান। শত্রুর দুটি বাংকারে গ্রেনেড চার্জ করে তছনছ করে দেন। এক পর্যায়ে শত্রুপক্ষের এলএমজির বুলেট বিদীর্ণ করে দেয় তাঁর দেহ। তিনি শহীদ হওয়ার কিছুদিন আগে ৩০ জুলাই টেকেরহাট থেকে বাবার কাছে এই পত্রটি লিখেছিলেন।

সংগ্রহ : মেজর (অব.) কামরুল হাসান ভুঁইয়া ও ড. সুকুমার বিশ্বাসের কাছ থেকে।

ADAMJEE JUTE MILLS LIMITED
JUTE
AGENCY
COMILLA

১.৮.৭১

মাগো,

তুমি আমায় ডাকছিলে? আমার মনে হলো তুমি আমার শিয়রে বসে কেবলই আমার নাম ধরে ডাকছো, তোমার অশ্রুজলে আমার বক্ষ ভেসে যাচ্ছে, তুমি এত কাঁদছো? আমি তোমার ডাকে সাড়া দিতে পারলাম না। তাই আমায় ডেকে ডেকে হয়রান হয়ে গেলে।

স্বপ্নে একবার তোমাকে দেখতে চেয়েছিলাম, তুমি আমার বড় আবদারের, ছেলের আবদার রক্ষা করতে এসেছিলে। কিন্তু মা, আমি তোমার সঙ্গে একটি কথাও বললাম না। দুচোখ মেলে কেবল তোমার অশ্রুজলই দেখলাম। তোমার চোখের জল মুছাতে এতটুকু চেষ্টা করলাম না।

মা, তুমি আমায় ক্ষমা করো—তোমায় বড় ব্যথা দিয়ে গেলাম। তোমাকে এতটুকু ব্যথা দিতেও তো চিরদিন আমার বুকে বেজেছে। তোমাকে দুঃখ দেওয়া আমার ইচ্ছা নয়। আমি স্বদেশ জননীর চোখের জল মুছাবার জন্য বুকের রক্ত দিতে এসেছি। তুমি আমায় আশীর্বাদ করো, নইলে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে না। একটিবার তোমাকে দেখে যেতে পারলাম না। সে জন্য আমার হৃদয়কে ভুল বুঝো না তুমি। তোমার কথা আমি এক মুহূর্তের জন্য ভুলিনি, মা। প্রতিনিয়তই তোমার আশীর্বাদ প্রার্থনা করি।

আমার অভাব যে তোমাকে পাগল করে তুলেছে তা আমি জানি। মাগো, আমি শুনেছি, তুমি ঘরের দরজায় এসে সবাইকে ডেকে ডেকে বলছ—

"ওগো, তোমরা আমার 'ইসহাক'-শূন্য রাজ্য দেখে যাও"

তোমার সেই ছবি আমার চোখের ওপর দিনরাত ভাসছে। তোমার এই কথাগুলি আমার হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে কান্নার সুর তোলে।

মাগো, তুমি অমন করে আর কেঁদো না। আমি যে সত্যের জন্য, স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতে এসেছি, তুমি তাতে আনন্দ পাও না?

কী করব মা? দেশ যে পরাধীন। দেশবাসী যে বিদেশির অত্যাচারে জর্জরিত। দেশমাতৃকা যে শৃঙ্খলাভারে অবনতা, লাঞ্ছিতা, অবমানিতা? তুমি কি সবই নীরবে সহ্য করবে মা? একটি সন্তানকেও কি তুমি মুক্তির জন্য উৎসর্গ করতে পারবে না? তুমি কি কেবলই কাঁদবে?

আর কেঁদো না মা। যাবার আগে আর একবার তুমি আমায় স্বপ্নে দেখা দিয়ো। আমি তোমার কাছে জানু পেতে ক্ষমা চাইব। আমি যে তোমার মনে বড় ব্যথা দিয়ে এসেছি মা। ইচ্ছে করে ছুটে গিয়ে তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে আসি। তুমি আদর করে আমাকে বুকে টেনে নিতে চাইছ, আমি তোমার হাত ছিনিয়ে চলে এসেছি। খাবারের থালা নিয়ে আমায় কত সাধাসাধিই না করেছ, আমি পেছন ফিরে চলে এসেছি।

না, আর পারছি না। ক্ষমা চাওয়া ভিন্ন আর আমার উপায় নেই। আমি তোমাকে দুদিন ধরে সমানে কাঁদিয়েছি। তোমার কাতর ক্রন্দন আমাকে এতটুকু টলাতে পারেনি।

কী আশ্চর্য মা, তোমার ইসহাক নিষ্ঠুর হতে পারল কী করে! ক্ষমা করো মা, আমায় তুমি ক্ষমা করো।

ইতি

ইসহাক

চিঠি লেখক : মুক্তিযোদ্ধা ইসহাক খান। ঠিকানা : ৪৭৬ উইলসন রোড, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ। তিনি বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ভৈরব খাদ্য গুদাম, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ।

চিঠি প্রাপক : মা, ফয়জনের নেসা। গ্রাম ও পো আটোমোর কচুয়া, চাঁদপুর (ইসহাক খান এক সহযোদ্ধার মাধ্যমে তাঁর মার কাছে এই চিঠিটি পাঠান)।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : লেখক নিজেই।

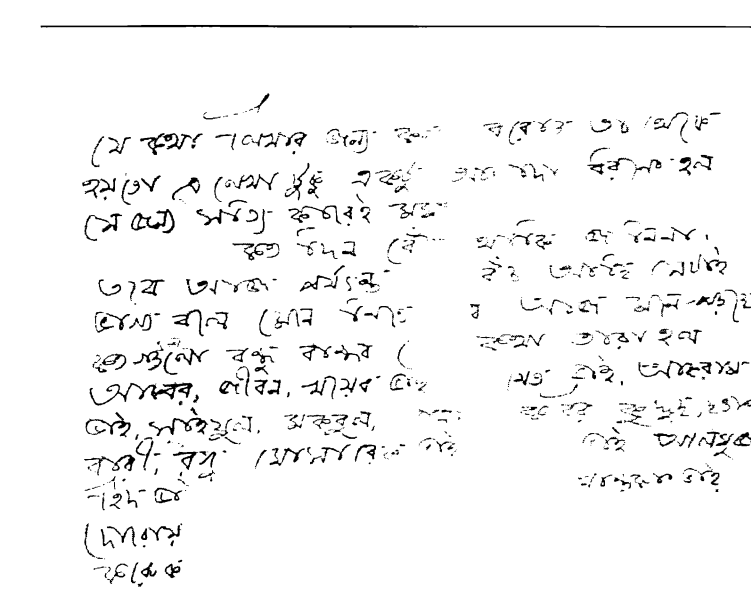

১.৮.৭১

যে কথা লিখার জন্য কলম ধরেছি তা থেকে হয়তো এ লেখাটুকু একটু আলাদা ধরনের হলো সে জন্য সত্যিকারেই মর্মাহত।

কত দিন বেঁচে থাকি জানি না, তবে আজ পর্যন্ত যে বেঁচে আছি সেটাই ভাগ্য বলে মেনে নিতে হবে। আজ মনে পড়ছে কতগুলো বন্ধু-বান্ধবদের কথা। তারা হলো আকবর, জীবন, খয়ের ভাই, এনায়েত ভাই, আকরাম ভাই, সাইফুল, মকবুল, আনছার, কবির, কুদ্দুছ, ছত্তার, বারী, রঙ্গু, মোসারেফ ভাই, মন্নান ভাই, আলমুজাহিদ ভাই, খালেক (পানের দোকানদার), খোন্দকার ভাই (দারোয়ান), খালেক (দারোয়ান), আজিজ, লতিফ, ফারুক, মালেক, সেকেন্দার, কাদের ভাই (রেস্টুরেন্টওয়ালা), মামু, লালু, শিলু, নাসরীন, নাসরীনের মা-বাবা, রানু, ওর মা বাবা, মিতা, হাই, হাই, ইদ্রিস, মোসারেফ ভাই, কত জনার কথা আর লেখা যায়? এরা ছিলাম এক সূত্রে গাঁথা। কে কে বেঁচে আছেন, আর কার কার সঙ্গে দেখা হবে। মামুন, আজিম, বকুল, ওরাও স্মৃতির পট থেকে বাদ যায়নি। তৈয়ব নানা নানু, রুবী খালা, ওরাও কোথায় আছে তাও জানা নেই। কোনোদিন দেখা করতে পারি কি না সন্দেহ। কালের ভয়াল গ্রাসে কে কোথায় আছে খোদাতায়ালাই জানেন। অনেক বন্ধু নিহত হওয়ার কথাও শুনেছি, কজনারই বা হিসাব দেব। স্মৃতিপটে সবই ভেসে ওঠে।

বাবলু

চিঠি লেখক : শহীদ আবুল কালাম (বাবলু), তাঁর পিতার নাম : শহীদ আবু বকর মিয়া, গ্রাম-পিজগলুয়া, ডাকঘর-জীবনদাসকাঠী, উপজেলা-রাজপুর, ডিজলা-ঝালকাঠী। ৩ অক্টোবর রাজাপুর থানার আঙ্গারিয়া নামক স্থানে পাক সেনা ও রাজাকারদের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে তিনি অস্ত্রসহ ধরা পড়েন। অমানুষিক নির্যাতনের পর ১১ অক্টোবর রাতে রাজাপুর থানায় তাঁকে হত্যা করা হয়। কয়েক দিন পর তাঁর পিতাকেও পাক সেনা ও রাজাকার বাহিনী গুলি করে হত্যা করে।

চিঠি প্রাপক : জানা সম্ভব হয়নি।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : আবুল কাইয়ুম হারিচ, কালাম মনজিল, নবগ্রাম রোড, বরিশাল।

বহরমপুর
নদীয়া, ভারত
০২/০৮/১৯৭১

মা,

তোমার শরীর ও মন ভালো আছে তো? আমি কোনোমতে বেঁচে আছি। তোমার দোয়া ও আল্লাহর রহমত ছাড়া কুষ্টিয়ার দৌলতপুরের গোয়ালগাঁ যুদ্ধ থেকে কোনোভাবেই বাঁচতে পারতাম না। তোমার চোখের জল আর বুকের যন্ত্রণা অবশ্যই থাকবে না। গত দশটি দিন আমি গ্রেনেডের আটটি স্প্লিন্টার-এর যন্ত্রণা নিয়ে বহরমপুর হাসপাতালের সার্জারি ওয়ার্ডের ১৬ নং বেডে খুব কষ্টে আছি মা। আমি তোমার একমাত্র দুরন্ত সন্তান। মাস্টারদার সরকারি প্রাথমিক স্কুলে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত আমি প্রথম হয়ে পাস করেছি। কাজেম, হযরত, সামাদ, রজব স্যারের স্নেহ ও আদর আমি কখনো ভুলতে পারি না। সিক্স ও সেভেনেও আমি প্রথম হয়ে অষ্টম শ্রেণীতে ওঠার পরপরই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সাতই মার্চের ভাষণে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশকে স্বাধীন করার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছি। মা, গোয়ালগাঁ-এর তোফায়েলউদ্দিনের বাড়িতে গত ২২/০৭/১৯৭১ তারিখের রাত্রিতে ২৫ সদস্যের উচ্চ প্রশিক্ষিত একটি প্লাটুন নিয়ে অবস্থান নিলাম দুই কিলো দূরে মঠমড়িয়া গ্রামে এক পাকসেনা ক্যাম্প গুঁড়িয়ে দেবার জন্য। ৪০/৫০ জন পাকসেনা ও রাজাকার মিলে ১০০ জনের দলটিকে নিশ্চিহ্ন করাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। বাড়িওয়ালা টিনশেডের পাকা দুই রুমে আমাদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। জানো মা, গোয়ালগাঁও-এর পাশ দিয়ে প্রবাহিত হাইলি নদীতে এখন প্রচণ্ড স্রোত আর পানিতে ভরপুর। এখন বর্ষাকাল, চারিদিকে পানি আর পানি! বাড়িওয়ালা পুঁটি ভাজি, শোল মাছের ঝোল আর কলাইয়ের ডাল দিয়ে আমাদের

খাইয়েছিলেন। একটু বিশ্রাম নিয়ে রাত তিনটায় ওই পাকসেনা ক্যাম্প আক্রমণ করব। কিন্তু বাড়িওয়ালার এক চাকর ওই পাকসেনা ক্যাম্পে রাত এগারোটার দিকে আমাদের অবস্থানের কথা জানিয়ে আসে। আমি, লতিফ ভাই, আব্দুল্লাহ, ওয়াজেদ, মমিন ও কাশেমসহ আরও অনেকেই এলএমজি, থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল ও অন্যান্য অস্ত্রপাতি দেয়ালের সঙ্গে খাড়া করে রেখে ঘুমিয়ে গেছি। একজন পাহারায় আছে। রাত একটার দিকে একদল পাকসেনা অতর্কিতে ওই বাড়িতে প্রবেশ করতেই আমাদের পাহারাদার জিজ্ঞেস করে, কে? উত্তরে উর্দুতে বলে 'তোদের জোম হ্যায়।' বলেই তাকে গুলি করে। এরপর আমাদের দুটো রুমকে লক্ষ্য করে বৃষ্টির মতো গুলিবর্ষণ শুরু হলো। আমাদের রুমের দরজাটা ব্রাশফায়ারে ঝাঁঝরা করে দিল। এক পর্যায়ে একটি গ্রেনেড নিক্ষেপ করল, বিস্ফোরিত হয়ে আমিসহ কয়েকজন রক্তাক্ত জখম হলাম। আমার তলপেটে, দুই উরু ও পায়ে মোট আটটি স্প্লিন্টার বিদ্ধ হয়ে যখন মৃত্যুর কাছাকাছি, তখন পেছনের জানালার কথা মনে পড়ল। রাইফেলের বাঁট দিয়ে জানালার চারটি শিক ভেঙে ঘরের পেছনের গোবরের পাংগোছের মাইটিলে রক্তাক্ত শরীর নিয়ে ধপাস করে পড়ে মনে হলো, আমি যেন গোবরের মধ্যে আটকে যাচ্ছি। প্রচণ্ড শীত, অবিরাম রক্তক্ষরণ, বৃষ্টির ন্যায় গোলাবর্ষণ আর অন্ধকার ভুতুড়ে পরিবেশে আমি কোনোমতে হামাগুড়ি দিয়ে একটি পুকুরের ঢালুতে ঢোলকলমি আর দাঁতছোলা গাছের ঘন ঝোপের মধ্যে আশ্রয় নিলাম। এরপর আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। সকাল দশটার দিকে কয়েকজন লোক আমাকে খুঁজে পায়। এরপর কলার ভেলাতে করে হাইলি নদী ও তারপর নৌকায় শিকারপুর। সেখান থেকে বহরমপুর হাসপাতালে আসার এক দিন পর আমার জ্ঞান ফেরে। মা, আমার প্রাক্তন সৈনিক বন্ধু ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধে শিয়ালকোট সেক্টরের বীর সেনানী সুবেদার মেজর আব্দুল লতিফ আমার অজ্ঞান রক্তাক্ত দেহকে কাঁধে করে কাদা ও পানির মধ্যে কয়েক মাইল হেঁটে নিয়ে এসেছিল। বন্ধুবর লতিফের ঋণ আমি কোনোদিন কিছু দিয়েও পরিশোধ করতে পারব না। জানো মা, আমার তলপেট ও দুই উরু হতে মোট পাঁচটি স্প্লিন্টার ডাক্তারগণ অপারেশন করে বের করেছেন। বাকি তিনটি এখনো আমার শরীরে বিদ্ধ আছে। ডাক্তার বলেছেন, এই তিনটি মাংসের সঙ্গে হজম হয়ে যাবে। মা! তুমি তো চাতক পাখির মতো চেয়ে থাকো আমার একটি চিঠি বা সংবাদের জন্য। কিন্তু এত মর্মান্তিক ও লোমহর্ষক কথা কীভাবে প্রকাশ করে তোমাকে জানাব তা ভেবে পাচ্ছি না। জানো মা, আমাদের আশ্রয়দাতা তোফায়েলউদ্দিন ভাই-এর পুরা পরিবার সেদিন কীভাবে চোখের পলকে নিঃশেষ হয়ে গেল!

পাকসেনাদের অত্যাধুনিক চায়নিজ এলএমজির ব্রাশফায়ার-এর মধ্যেই আমরা আল্লাহর ওপর দৃঢ় বিশ্বাস ও অবিচল সাহস নিয়ে রাশিয়ান থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল, এলএমজি, এসএমজি আর কিছু গ্রেনেড ও গোলা বারুদ নিয়ে বীরত্বের সাথে মোকাবিলা করে যাচ্ছি। আমরা ছিলাম আধা ঘুমন্ত, ঘরের মধ্যে অবরুদ্ধ ও অপ্রস্তুত। এই অবস্থায় যে যার অবস্থান থেকে অতি সতর্ক ও ধৈর্যের সাথে অত্যাধুনিক নানা অস্ত্রে সজ্জিত ও উচ্চ প্রশিক্ষিত পাকসেনাদের মোকাবিলা করেছি। কিন্তু জানো মা, আমাদের উভয় পক্ষের বৃষ্টির মতো গোলাগুলির মাঝে দৌড়াদৌড়ির কারণে বাড়িওয়ালা তোফায়েলউদ্দিন, তার শাশুড়ি, তার স্ত্রী, দুই ছেলে ও এক মেয়ে আমাদের এক বীর সহযোদ্ধা ওয়াজেদ আলী ঘটনাস্থলেই শহীদ হলেন এবং আরেক সহযোদ্ধা মমিন চরম আহত ও মুমূর্ষু ও অজ্ঞান অবস্থায় বহরমপুরের এই হাসপাতালে আমার চোখের সামনেই মৃত্যুর কোমল স্পর্শে মিশে গেল চিরদিনের মতো। মা, মুমিন আমাকে বড় কষ্ট দিয়ে চিরদিনের মতো চলে গেল!! আমার সঙ্গে যুদ্ধের ময়দানে সামান্য কিছু কথা হয়েছিল। কিন্তু এখানে সে একটি কথাও বলল না। ওয়াজেদ ও মমিনকে হারিয়ে আমি বড়ই কষ্ট পেয়েছি মা। সবচেয়ে মর্মান্তিক এই যে, ওয়াজেদ, ছিল বাবা-মার একমাত্র সন্তান। দেশ স্বাধীন হবে ঠিকই কিন্তু ওয়াজেদ মমিনদের সেই স্বাধীন দেশে কোনোদিনই খুঁজে পাওয়া যাবে না। জানো মা, আল্লাহর কী লীলা খেলা! তোফায়েলউদ্দিন ভাই-এর চার মাসের একটি ছেলে কি অলৌকিকভাবে বেঁচে গিয়েছিল সেদিনের যুদ্ধে। উভয় পক্ষের ব্রাশফায়ারের মধ্যে পড়ে তার পরিবারের সবাই মারা গেল ঠিকই কিন্তু চার মাসের নিষ্পাপ অবুঝ শিশুটি লেপ-কম্বলের নিচে থাকায় কোনো এলএমজির গুলি তাকে স্পর্শ করেনি। মা, তুমি আমার জন্য দোয়া করো। আমি যেন সুস্থ হয়ে আবার স্বাধীনতাযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে ও দেশকে শত্রুমুক্ত করতে পারি। মা, তোফায়েলউদ্দিনের চার মাসের শিশু মুক্তিকে কে লালন-পালন করবে? কে বুকের দুধ খাওয়াবে? তার বাড়ির চাকরের বিশ্বাসঘাতকতায় নবাব সিরাজের মতো অবস্থা হলো তোফায়েলউদ্দিন ভাই-এর, শহীদ হলো ওয়াজেদ, মমিন আর আহত হলাম আমরা কজন। মা, আর লিখতে পারছি না। চিঠিটা সাবধানে পড়বে। আমি যদি বেঁচে থাকি, দেখা হবে ইনশাল্লাহ।

ইতি

তোমার রণাঙ্গনের যোদ্ধা সন্তান

রহিম/ বহরমপুর হাসপাতাল, ভারত।

চিঠি লেখক : মুক্তিযোদ্ধা মো. আবদুর রহিম। তাঁর বর্তমান ঠিকানা : ৪২ টাইগার রোড, ওয়ার্ড-৩, নওদাপাড়া, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।

চিঠি প্রাপক : মা মেহেরুন্নেসা। মুক্তিযোদ্ধার পিতার নাম হারান মণ্ডল।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : লেখক নিজেই।

Tuesday 3rd AUGUST 1971

Beng.—17 sraban 1378—dwadoshi 4.42 a. m.—Saka—12 sravana 1893

17 shaon 1378—11 jamada-s-sani '91—28 sraban 1378—12 sraban sudi '28

Sunrise—5.10 (21) —6.15 p. m.

০৩/০৮/৭১

মা,

আমার সালাম নিয়ো। অনেক পাহাড় পর্বত, নদী প্রান্তর পেরিয়ে, সমস্ত বাধা অতিক্রম করে তোমার ছেলে তার অনেক আকাঙ্ক্ষার শেষ ঠিকানা আজ খুঁজে পেয়েছে। হ্যাঁ মা, আমি পৌঁছে গেছি আমার ইচ্ছার কেন্দ্রবিন্দুতে। নিজেকে এবার প্রস্তুত করব প্রতিশোধ নেওয়ার এক বিশাল শক্তি হিসেবে। আমার প্রতিশ্রুতি আমি কখনো ভুলব না। ওদের উপযুক্ত জবাব আমাদের দিতেই হবে। মা, তুমি এই মুহূর্তে আমাকে দেখলে চিনতে পারবে না। বিশাল বাবড়ি চুল, মুখভর্তি দাড়ি গোঁফ। যদিও আমি নিজের চেহারাটা বহুদিন দেখি না কারণ এখানে কোনো আয়না নেই। মিহির বলে, আমাকে নাকি আফ্রিকার জংলিদের মতো লাগে। মিহির ঠিকই বলে, কারণ, এখন আমি নিজেই বুঝি আমার মাঝে একটি জংলি ভাব এসে গেছে। সেই আগের আমি আর নেই। তোমার মনে আছে মা, মুরগি জবাই করা আমি দেখতে পারতাম না। আর সেই আমি আজ রক্তের নদীতে সাঁতার কাটি।

খাওয়াদাওয়ার কথা বলে লাভ নেই, দুঃখ পাবে। তবে বেঁচে আছি ও খুব ভালো আছি। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে আমরা আর সেই দিনটি থেকে খুব দূরে নাই, যখন আমরা আবার মুখোমুখি হব। দোয়া করো মা, যেন সেই দিনটি পর্যন্ত বেঁচে থাকি। মনি ভাই আমাদের officer করেনি কারণ ওনার অন্য কাজের জন্য আমাদের প্রয়োজন পড়বে। এখানে আমার অনেক পুরান বন্ধুর দেখা পেলাম। আমার আগের চিঠিটা হয়তো এত দিনে পেয়ে গেছ। সেলিম তোমার সাথে দেখা করে এসেছে, বলল। তোমরা ভালো আছ জেনে খুশি হলাম। আমার জন্য কোনো চিন্তা কোরো না। মায়ের দোয়া আমার সাথে আছে, আমার ভয় কী? অনেক লেখার ইচ্ছা করছে কিন্তু সম্ভব হচ্ছে না। কত ঘটনা মনে জমা হয়ে আছে তোমাদের বলার জন্য! হয়তো অনেক বছর লেগে যাবে শেষ করতে। মন্টু চিঠি নিয়ে যাচ্ছে। পারলে ওকে একটু ভালো কিছু খাবারদাবার দিয়ো। অনেক দিন ও ভালো কিছু খায়নি। আজ তাহলে-৮০, সবাইকে সালাম ও দোয়া দিও।

তোমার স্নেহের ফেরদৌস

চিঠি লেখক : মুক্তিযোদ্ধা ফেরদৌস কামাল উদ্দীন মাহমুদ। তাঁর বর্তমান ঠিকানা : ফ্ল্যাট-৫০০, কনকর্ড কটেজ, প্লট ৮ আই, রোড-৮১, গুলশান-২, ঢাকা।

চিঠি প্রাপক : মা, হাসিনা মাহমুদ। তাঁর তখনকার ঠিকানা : ৮৩ লেক সার্কাস, কলাবাগান, ঢাকা।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : লেখক নিজেই।

বি আহাম্মদ
বড়গ্রাম
৩.৮.৭১

শ্রদ্ধেয় শহীদুল্লাহ্ ভাই,

সালাম নেবেন। আপনার সঙ্গে দেখা করব করব করেও সম্ভব হয়ে উঠছে না। আপনার বড়গ্রাম অপারেশন ক্যাম্প নিয়ে বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। আপনি নিজেও একবার এলেন না। আশা করি আগামীতে একবার এসে ক্যাম্প পরিদর্শন করে যাবেন। তা ছাড়া অপারেশন বিষয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলাপ আছে। অর্থাৎ (গোদাগাড়ী) ক্যাম্প উঠিয়ে দিতে হলে আপনার সঙ্গে মিলিতভাবে একটা প্ল্যান করা দরকার। যা হোক একটু দোয়া রাখবেন, যেন অবিলম্বে আমরা একটা বড় রকমের অপারেশন করতে পারি। আর সে কাজে কিছু অটোমেটিক হাতিয়ার দরকার। অনেক চেষ্টা করেও উদ্ধার বা সংগ্রহ করা গেল না। বর্তমানে কাটলা ইয়ুথ ক্যাম্পে নাকি দু-একটি LMG রাইফেল আছে। যদি দয়া করে সেগুলো আপনাদের বড়গ্রাম ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেন তো যারপরনাই উপকার হবে এবং আশা করি আপনি তার ত্রুটি করবেন না।

ইতি আপনার মাস্টার ভাই
বেশারউদ্দীন আহাম্মদ
৩.৮.৭১

চিঠি লেখক : মুক্তিযোদ্ধা বেশারউদ্দীন আহমদ। বড়গ্রাম অপারেশন ক্যাম্পে ছিলেন।
চিঠি প্রাপক : মুক্তিযোদ্ধা শহীদুল্লাহ্, কাটলা যুব ক্যাম্প।
সংগ্রহ : মে. জে. (অব.) ফজলুর রহমানের কাছ থেকে।

হরিণা যুব প্রশিক্ষণ শিবির
৩.৮.১৯৭১

স্নেহের ছোট ভাই বাবুল

লিখার শুরুতেই আমার স্নেহাশিস দোয়া নিয়ো। আব্বাকে আমার সালাম ও কদমবুছি বলিয়ো, আম্মাকেও আমার সালাম ও কদমবুসি বলিয়ো। আমি তোমাদেরকে না বলিয়া ভারত চলিয়া আসিয়াছি। হরিণা ক্যাম্পে আছি, আমার জন্য কোনো চিন্তা করিয়ো না। আমি স্বপন চৌধুরীর অধীনে আছি। রুপেন চৌধুরী হরিণা ক্যাম্পের যুব প্রশিক্ষণ শিবিরের দায়িত্বে আছে। আমাকে বেশ স্নেহ করে। আমার কাজ শুধু ক্যাম্পের ভিতর। আমার জন্য কোনো চিন্তা করিয়ো না। এইখানে আসিয়া বহু বড় বড় ছাত্রনেতার সহিত পরিচয় হইয়াছে। রব ভাই, রাজ্জাক ভাই, তোফায়েল ভাই, মাখন ভাই, ইনু ভাই ও আমাদের দক্ষিণ পাড়ার মনির আহামদ, এ সবাইয়ের সহিত আমার দেখা হইয়াছে, সবাই ভালো আছে। যুদ্ধ যখন শুরু হইয়াছে, খুব সাবধানে থাকিবা, না হয় তোমরা নানার বাড়িতে চলিয়া যাও। না হয় রামগড় দিয়া ভারতে চলিয়া আসো। দেশ স্বাধীন করার জন্য দেশের বহু লোকজন এ দেশে আসিয়াছে, যুদ্ধ করিতেছে, তোমরা শুধু দোয়া করিবে দেশ যেন তাড়াতাড়ি স্বাধীন হয়। মৌলানা আবদুল্লা মোজাহিদ বাহিনীর প্রধান হইয়াছে। সেই আমাদের গরু নিয়া গিয়াছে বলিয়া শুনিয়াছি, চিন্তা করিয়ো না। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করো, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যেন পরাজয় বরণ করে। রাজাকাররা ধান লইয়া গিয়াছে তাহাও শুনিয়াছি, আদিনাথ কাকা সব ঘটনা বলিয়াছে। শুনিয়া আমার খুবই খারাপ লাগিতেছে। আমার জন্য তোমরা কোনো চিন্তা করিয়ো না। জানিতে পারিলাম মামা আবদুর রাজ্জাক সাহেব পাকবাহিনীর সাথে যুদ্ধ অবস্থায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া যুদ্ধে শহীদ হইয়াছে। মাকে এই কথা বলিয়ো না। যদি দেশ

স্বাধীন হয় তাহা হলে তোমাদের সাথে দেখা হইবে। যুদ্ধে যদি আমি মারাও যাই, কোনো চিন্তা করিয়ো না। যদি আমার রক্তের বিনিময়ে দেশ স্বাধীন হয়, দেশের মানুষ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র পায়, তাহা হইলে আমার আত্মা শান্তি পাইবে। আমার জন্য সবাই দোয়া করিবা।

খোদা হাফেজ

তোমার বড় ভাই
মোহা. আইয়ুব খান

মুক্তিবাহিনীর সদস্য
হরিণা যুব প্রশিক্ষণ শিবির, হরিণা, ভারত।

চিঠি লেখক : মো. আইয়ুব খান।

চিঠি প্রাপক : বাবুল।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : জনাব বাবুল। পো : ডেমশা, থানা সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

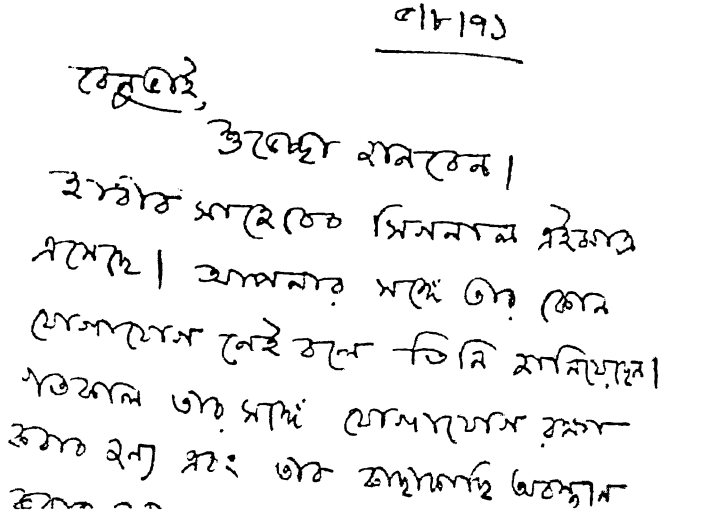

৫/৮/৭১

বেনু ভাই,

শুভেচ্ছা জানবেন।

হাবীব সাহেবের সিগনাল এইমাত্র এসেছে। আপনার সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ নেই বলে তিনি জানিয়েছেন। গতকাল তার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য এবং তার কাছাকাছি অবস্থান করার জন্য আপনাকে লিখেছিলাম। হাবীব সাহেবের কাছাকাছি থাকবেন। পুংলীর পুল পার হবেন না। কারণ, বিপদে পড়তে পারেন। হাবীব সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করে ফেলুন। আজ এনায়েত করীম সাহেব কিছু লোকজন এবং অস্ত্র নিয়ে আসবেন। সম্ভব হলে আপনাকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করব। বর্তমানে কোনো রিস্ক না নিয়ে হাবীব সাহেবের সঙ্গে মিলিত হয়ে ওই এলাকার অপারেশন সফল করুন। কারণ, এই অপারেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশেষ জরুরি পরিকল্পনা অনুযায়ী তৈরি হয়েছে। আশা করি, আপনারা দুইজন একত্রভাবে কাজ করে সফল হবেন। সব সময় আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন। কারণ, হেডকোয়ার্টারে নিয়মিত খবর পাঠাতে হয়। আপনারা কোনো চাঁদা জোর করে তুলবেন না। জয় বাংলা।

বুলবুল খান মাহবুব

চিঠি লেখক : মুক্তিযোদ্ধা বুলবুল খান মাহবুব। ঠিকানা : সদর সড়ক, জনতা ব্যাংক ভবন, ৪র্থ তলা, টাঙ্গাইল।

চিঠি প্রাপক : হাবিবুল হক খান বেনু। গ্রাম : কোলাহাট, গৌরাঙ্গী, টাঙ্গাইল।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : আবদুস ছাত্তার খান। গ্রাম ও পো. অর্জুনা, উপজেলা : ভুয়াপুর, জেলা : টাঙ্গাইল।

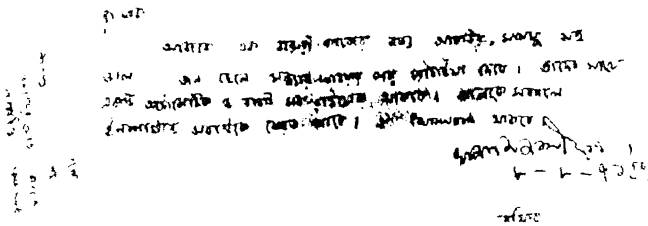

৮-৮-৭১ ইং

রফিক,
আজকে এক জরুরি কাজের জন্য আতাউর, সামসুসহ ভালো ভালো ৬ জন ছেলে সন্ধ্যার খাওয়ার পর পাঠিয়ে দেবে। তাদের সঙ্গে একটি অটোমেটিক ও বাকি সব রাইফেল থাকবে। কালকে সকালে ইনশাল্লাহ্ সবাইকে ফেরত পাবে। ওই Password থাকবে।
খাজা নিজামুদ্দীন

বি. দ্র. কিছুক্ষণ আগে এক গাড়ি পাকসেনা আটগ্রাম গিয়েছে। ওরা আচমকা আমাদের আক্রমণ করতে পারে। আটগ্রাম খবর পাঠাবে। Explosive চাই।

৯/৮/৭১ ইং

রফিক,
এই মাত্র খবর পেলাম রাজপুর স্কুলে ও রামপুরে পাঞ্জাবিরা বাঙ্কার করছে। আমি আজকে সেদিকে যাব। তোমার গ্রুপ নদীর পার থেকে রাত্রে আমাদের গ্রুপের পর পরই Firc খুলবে।
কালকে কেন্দ্রে আসবে।
খাজা নিজামুদ্দীন

2/9

Please allow Mr. A. K. M. Rafiqul Haq to visit the bazar and return by.

Sd/
KHWAJA NIZAMUDDIN

Jalalpur Camp
Mukti Fouj.

চিঠি লেখক : শহীদ মুক্তিযোদ্ধা খাজা নিজামুদ্দীন বীর উত্তম, তিনি এই চিঠিগুলো লিখেছেন জালালপুর ক্যাম্প থেকে।

চিঠি প্রাপক : মুক্তিযোদ্ধা একেএম রফিকুল হক বীর প্রতীক। তাঁর স্থায়ী ঠিকানা : জোনাকী নীড়, পুরাতন কোর্ট রোড, কিশোরগঞ্জ। বর্তমান ঠিকানা : বাড়ি-৫২, সড়ক-১৫, সেক্টর-১১, উত্তরা, ঢাকা।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : প্রাপক নিজেই

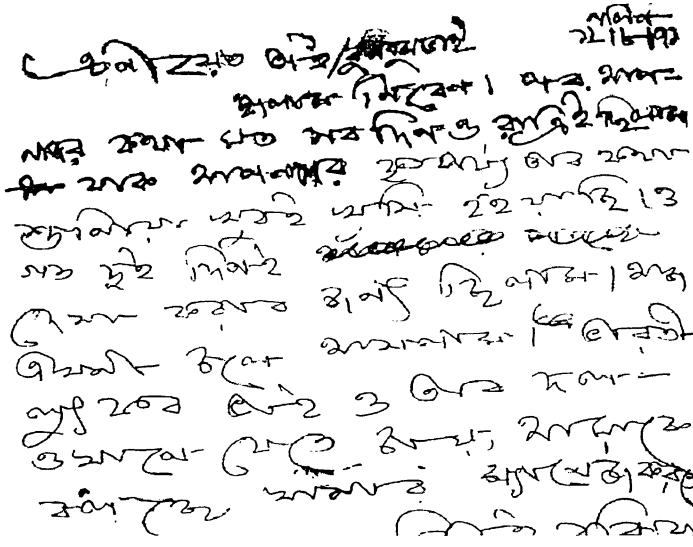

নলিন
১২/০৮/৭১

এনায়েত ভাই/বুলবুল ভাই

সালাম নেবেন। পর, আপনার কথামতো পরদিন ও রাত্রিই ছিলাম। যাক, আপনাদের কৃতকার্যতার কথা শুনিয়া খুবই খুশি হইয়াছি। গত দুই দিনই দেখা করার জন্য ছিলাম। আজ এখনই চলিয়া আসিলাম। ভারতী, লুৎফর ভাই ও তার দল—ওখানে যাইতে চায়, আমাকে বলিয়াছে খাবার ম্যানেজ করিতে। আমি কী করিব কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আপনার কী মত তাহাও তো জানি না। আপনার মত ছাড়া আমি ঠিক মনে করি না। উহাদের কথা না শুনিয়াও কী করা যায়।

ইহারা হেমনগর উঠিতে চায়। আপনি আপনার বুদ্ধি দিয়া আমাকে সাহায্য করুন। এদিকে ভুয়াপুরের Protection দেওয়া নেহাত উচিত। ভুয়াপুর খোদা না করুক, কিছু হইলে আমাদের আর উপায় নাই।

ইতি
আঙ্গুর তালুকদার
নলিন

চিঠি লিখেছেন : মুক্তিযোদ্ধা আঙ্গুর তালুকদার (পুরো নাম মো. নূর হোসেন আঙ্গুর তালুকদার)। কাদেরিয়া বাহিনীর একটি ইউনিটের কমান্ডার ছিলেন। তাঁর বর্তমান ঠিকানা : নলিন, গোপালপুর, টাঙ্গাইল।

চিঠি প্রাপক : আবু মোহাম্মদ এনায়েত করিম ও বুলবুল খান মাহবুব। টাঙ্গাইল।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : আবদুস ছাত্তার খান।

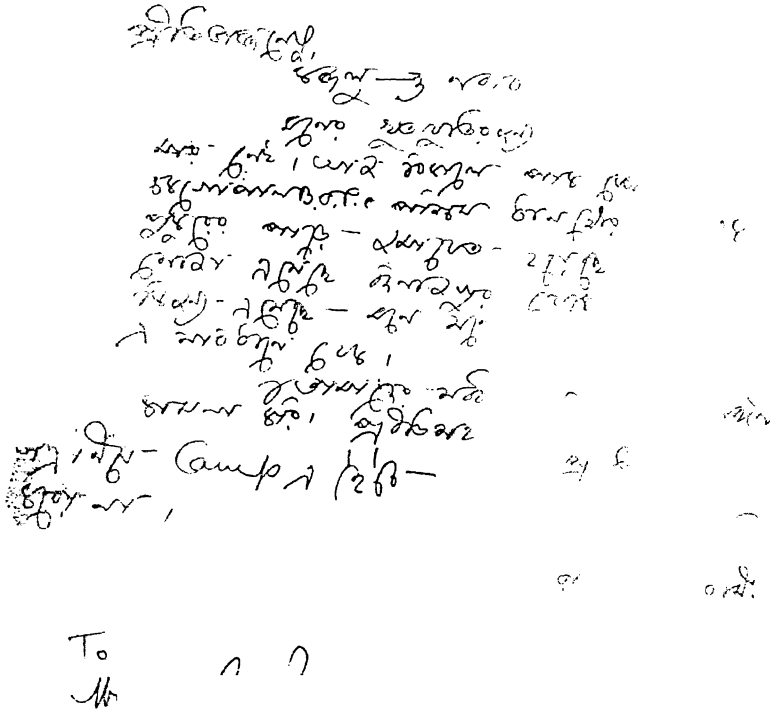

১৫.৮.৭১
রাত ৯-৩০ মি.

প্রীতিভাজনেষু ফজলু ও নবাব,
মনের খুঁতখুঁতির জন্য লিখছি। সাবধানের মার নেই। আজ বিকেলে পাক-ফোর্স নাকি চক গোপাল বিওপি পশ্চিম ধানক্ষেতের মধ্যে এক পুকুরের পাড়ে জমায়েত হয়েছে। তারা সোজা এসেছে দিনাজপুর থেকে। কেন এসেছে, কী জন্য এসেছে—মনে সন্দেহ। তোমরা Camp-এ সাবধানে থেকো।
তোমাদের সর্বাঙ্গীণ কুশল ও মঙ্গল কামনা করি। প্রীতিসহ।
পত্র নিয়ে Camp-এ হইচই কোরো না।
প্রীতিধন্য
মো. আ. রহিম

চিঠি লেখক : মুক্তিযোদ্ধা মো. আ. রহিম
চিঠি প্রাপক : ফজলুর রহমান ও জনাব নওয়াব, ওসি, কাটলা ক্যাম্প মুক্তিযোদ্ধা।
সংগ্রহ : মে. জে. (অব.) ফজলুর রহমানের কাছ থেকে।

DATE
NOTES

২৫.০৮.১৯৭১

মা,

আমার সালাম নিবেন। ভাবির কাছ থেকে আপনার চিঠি পেলাম। আপনি আমার জন্য সব সময় চিন্তা করেন। কিন্তু মা, আপনার পুত্র হয়ে জন্ম নিয়ে মাতৃভূমির এই দুর্দিনে কি চুপ করে বসে থাকতে পারি? আর আপনিই বা আমার মতো এক পুত্রের জন্য কেন চিন্তা করবেন? পূর্ব বাংলার সব যুবকই তো আপনার পুত্র। সবার কথা চিন্তা করুন। আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ করুন, যেন আমরা যে কাজে নেমেছি তাতে সাফল্য লাভ করতে পারি। তবেই না আপনার পুত্র হয়ে জন্ম নেওয়া সার্থক হবে।

আমাদের বিজয়েই না আপনার এবং শত শত জননীর গৌরব।

শুনতে পেলাম আপনার শরীর খুব খারাপ। শরীরের দিকে নজর দেন। কেননা বিজয়ের পর যে উৎসব হবে, সেই উৎসবে আপনাকেই তো আমাদের গলায় মালা পরিয়ে দিতে হবে। আপনি তো শুধু আমার জননীই নন, শত শত বিপ্লবী যুবকের মা।

আপনি আমাকে বাড়ি আসতে লিখেছেন। এই মুহূর্তে তা সম্ভব হচ্ছে না। তবে আশা করি সামনের মাসের প্রথম দিকে বাড়ি আসতে পারব। আমার জন্য চিন্তা না করে আশীর্বাদ করবেন। আব্বাকে আমার সালাম জানাবেন আর ছোটদেরকে স্নেহাশীষ।

আমি ভালো আছি

ইতি

আপনার শত শত বিপ্লবী যুবক সন্তানদের একজন

আজু

চিঠি লেখক : শহীদ মুক্তিযোদ্ধা মুন্সী আবু হাসমত রশিদ। তিনি সাভারের কাছে শিমুলতলীতে ২৫ অথবা ২৭ আগস্ট শহীদ হন। আজু তাঁর ডাকনাম।

চিঠি প্রাপক : মা, তাহমিনা বেগম। গ্রাম : কমলাপুর, পো : জানিপুর, খোকশা, কুষ্টিয়া।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : পারভিন সুলতানা, মিরপুর ম্যানশন, প্লট ৮, রোড ২, ব্লক ডি, মিরপুর-২, ঢাকা ১২১৬।

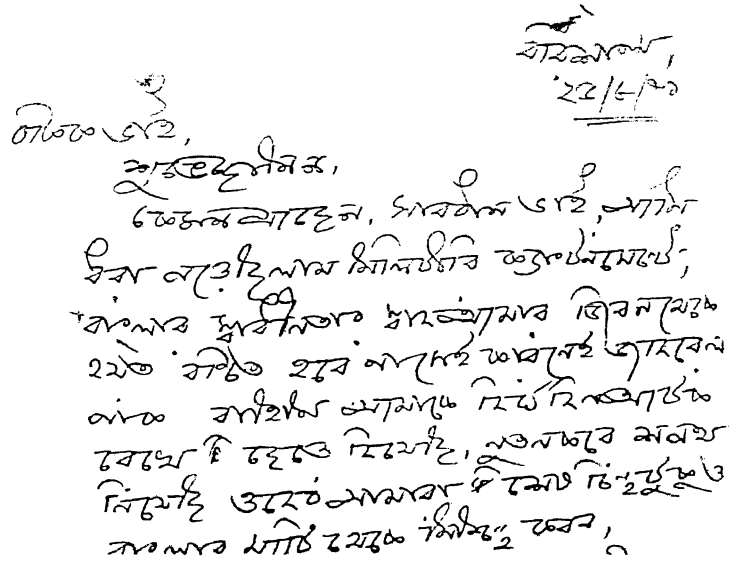

বরিশাল
২৫/০৮/৭১

রফিক ভাই,
শুভেচ্ছা নিন।
কেমন আছেন, সাবধান ভাই, আমি ধরা পড়েছিলাম মিলিটারি ক্যান্টনমেন্টে। বাংলার স্বাধীনতার স্বাদ আমার জীবন থেকে হয়তো বঞ্চিত হবে না সেই কারণেই জাঁদরেল পাক বাহিনী আমাকে দীর্ঘদিন আটক রেখে ছেড়ে দিয়েছে। নতুন করে শপথ নিয়েছি ওদের আমরা শেষ চিহ্নটুকুও বাংলার মাটি থেকে নিশ্চিহ্ন করব।
আপনারা চাখারের বানাড়ীপাড়ায় কী ধরনের অপারেশন করছেন। সাবধান, শপথ নিয়ে নেমেছেন ও নেমেছি, পিছপা হব না বা হবেন না।
রফিক ভাই, জানি না কবে আমরা আবার পাশাপাশি মুক্ত দেশের মুক্ত হাওয়ায় প্রাণ খুলে কথা বলতে পারব।
আপনার মঙ্গল কামনা করি। জয় বাংলা, বাংলাদেশ অমর হউক।

ইতি
আপনারই
মনু

চিঠি লেখক : মুক্তিযোদ্ধা মহিউদ্দিন মনু। কাউনিয়া, বরিশাল।
চিঠি প্রাপক : এটিএম রফিকুল ইসলাম। বর্তমান ঠিকানা ৮ নং হাউজিং কলোনি, পটুয়াখালী।
চিঠিটি পাঠিয়েছেন : প্রাপক নিজেই।

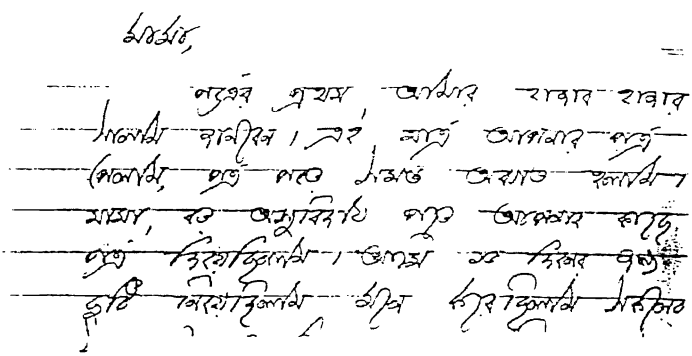

১২.০৯.৭১

মামা,

পত্রের প্রথম আমার হাজার হাজার সালাম জানবেন। এইমাত্র আপনার পত্র পেলাম, পত্র পড়ে সব অবগত হলাম। মামা, বড় অসুবিধায় পড়ে আপনার কাছে পত্র দিয়েছিলাম। আমি ১৫ দিনের জন্য ছুটি নিয়েছিলাম। মনে করেছিলাম সকলের সঙ্গে একবার দেখা করব কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে কারও সঙ্গেই দেখা করতে পারলাম না। জানি না এরপর আর কোনো দিন দেখা করতে পারব কি না। মামা, আম্মা এবং আব্বার প্রতি নজর রাখবেন, আমার মতো তাদের বিমুখ করবেন না। এখনো কয়েক দিন ছুটি আছে। এ কয় দিন কোথায় থাকব জানি না। এর কয় দিন পর যাব সেখানে যেখানে আমাদের স্থান। তারপর কোথায় থাকব জানি না। আমার জন্য এবং দেশের জন্য দোয়া করবেন। বাড়িতে চিন্তা করতে মানা করবেন। যেমনি হোক বেঁচে থাকব, কেননা ন্যায়ের পথে আছি, মরে যাই যাব, কোনো দুঃখ নেই, তবু মনে করব কিছু করেছি। আমার কাছে একটা transistor আছে। সেটা তোতা মামার কাছে রেখে যাব। যদি পারি তবে পরে পাঠাব। আপনি তোতাকে চিনবেন না। ওরা খুব ভালো তাই সবই নিয়েছে। তাদের জন্যই আপনি (...) মাফ করবেন, একদিন বুঝবেন ঠিকই। মিন্টু ভাইয়ের খোঁজ মনে হয় পাননি। মামানিকে এই পাগলের জন্য দোয়া করতে বলবেন এবং সালাম জানাবেন। মেরী কেমন? তাকেও দোয়া করতে বলবেন। আপনাদের দোয়াই আমাদের সকলের পাথেয়। ভুল ক্ষমা করবেন।

ইতি

আজিজুর

চিঠি লেখক : মুক্তিযোদ্ধা আজিজুর রহমান তরফদার (আজিজ বাঙ্গাল)।

চিঠি প্রাপক : তৎকালীন মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক খন্দকার আবদুল হাই।

সংগ্রহ : আবদুস ছাত্তার খান। ২০০১ সালের ২১ জানুয়ারি প্রাবন্ধিক ও গবেষক শফিউদ্দিন তালুকদার চিঠিটি টেপিপাড়া, ভুয়াপুর, টাঙ্গাইল থেকে সংগ্রহ করেন। আবদুস ছাত্তার খান চিঠিটি তাঁর কাছ থেকে সংগ্রহ করে পাঠিয়েছেন।

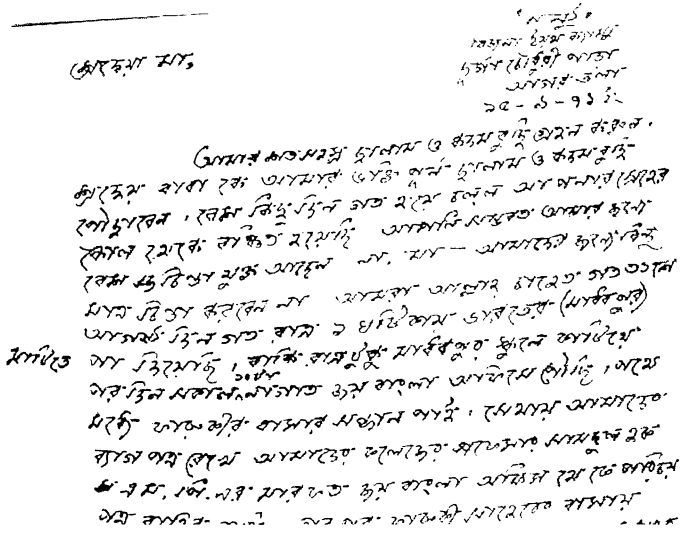

'মন্টু'
বিজনা ইয়থ ক্যাম্প
দুর্গা চৌধুরীপাড়া
আগরতলা
১৫-০৯-৭১ ইং

শ্রদ্ধেয়া মা,

আমার শতসহস্র সালাম ও কদমবুসি গ্রহণ করুন। শ্রদ্ধেয় বাবাকে আমার ভক্তিপূর্ণ সালাম ও কদমবুসি পৌছাবেন। বেশ কিছুদিন গত হতে চল্‌ল আপনার স্নেহের কোল থেকে বঞ্চিত হয়েছি। আপনি সম্ভবত আমার জন্যে বেশ চিন্তাযুক্ত আছেন। না, মা—আমাদের জন্যে বিন্দুমাত্র চিন্তা করবেন না। আমরা আল্লাহ্ চাহে তো গত ৩১শে আগস্ট দিনগত রাত্র ১ ঘটিকায় ভারতের (মাধবপুর) মাটিতে পা দিয়েছি। বাকি রাত্রটুকু মাধবপুর স্কুলে কাটিয়ে পরদিন সকাল ১০টা নাগাদ জয় বাংলা অফিসে পৌছি। পথিমধ্যে ফারুকীর বাসার সন্ধান পাই। সেখানে আমাদের ব্যাগপত্র রেখে আমাদের কলেজের প্রফেসর সামছুল হক এমপির মারফত 'জয় বাংলা' অফিস থেকে পরিচয়পত্র বের করি। তারপর ফারুকী সাহেবের বাসায় এসে ওনার একখানা পত্র নিয়ে আগরতলা শহর থেকে আট-দশ মাইল দূরে দুর্গা চৌধুরী পাড়ায় 'বিজনা ইয়থ ক্যাম্পে' চলে আসি। এখানে পাশাপাশি ইছামতী ও যমুনা নামে আরো দুটো ইয়থ ক্যাম্প রয়েছে। সত্যি মা, এগুলো ইয়থ ক্যাম্প নয়, যেন 'ইয়থ ফেয়ার' (Youth Fair)। এ যুব মেলায় বাংলাদেশের নানা স্থানের যুবকদেরই সমাবেশ ঘটেছে। খাওয়াদাওয়ার একটু অসুবিধা হলেও বড় আনন্দেই এ মেলায় দিন কাটাচ্ছি। বাংলাদেশের কত ছেলের সাথে পরিচয় হয়েছে! কত ছেলের

পরিচয় নিয়েছি! কত ছেলেকে পরিচয় দিয়েছি! অবশ্য প্রথম দিন হিটলার মামাকে নিয়ে একটু প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। বর্তমানে আমরা ঢাকার হিসাবে বেশ সমাদর ও সম্মান পাচ্ছি। সুবেহ্ সাদেকের সময় আজানের ধ্বনি শুনে মনে হয় বাংলাদেশেরই (তথাকথিত পূর্ব পাক) কোনো স্থানে শুয়ে আছি। আজান শেষ হওয়ার পর ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাকটরের বাঁশির ধ্বনি ও মধুর ডাক 'উঠুন' 'উঠুন' বড়ই ভালো লাগে। তারপর হাত মুখ ধুয়ে যার যার প্রার্থনা সেরে শুরু হয় পিটির পালা। ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাকটর (আসাদুল্লা ভূঞা) সবাইকে নিয়ে স্থানীয় স্কুলের মাঠে প্রায় দেড় ঘন্টা নানা ধরনের পিটি করিয়ে যার যার প্লাটুনে নিয়ে আসেন। সকলের চোখেমুখে এক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। স্বাধিকার আদায়ের দৃপ্ত শপথে আজ সবাই উজ্জীবিত। আনন্দের বিষয় এই যে, আমরা গত ১৩ই সেপ্টেম্বর রিক্রুড হয়েছি। সম্ভবত আজ না হয় কালই ট্রেনিং সেন্টারে চলে যাব। আনন্দ এই জন্য যে, আমাদের দুই মাস পূর্বের বহু ছেলেও এখানে জমা হয়ে আছে। যাহোক, দোয়া করবেন যেন সুন্দর সুষ্ঠুভাবে আমরা ট্রেনিং নিয়ে মাতৃভূমিকে হানাদার শত্রুদের হাত হতে রক্ষা করতে পারি। বিশেষ আর কী লিখব। দেশের খবরাদির জন্যও খুব উদ্বিগ্ন। বড়দের সালাম ও ছোটদের স্নেহাশিস দিয়ে পত্রের এখানেই শেষ করছি।

ইতি
আপনার স্নেহের
মন্টু

চিঠি লেখক : মুক্তিযোদ্ধা ইফতেখার উদ্দিন আহমেদ মন্টু। বর্তমান ঠিকানা বাড়ি এ/৭, ফ্ল্যাট-সি-১, বর্ধিত পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা ১২১৫।

চিঠি প্রাপক : মা। আফিফা আখতার। গ্রাম : রূপসী, থানা : রূপগঞ্জ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : লেখক নিজেই।

জয় বাংলা

তারিখ : ২৫-০৯-৭১

আব্বাজান,

আমার সালাম ও কদমবুসি গ্রহণ করুন। ইদানীং আসার পর হতে মনটা খুবই উদ্বিগ্ন। মন থেকে দুশ্চিন্তা মুছতে পারছি না। কয়েক দিন হয় একটি খবর পেলাম, আমাদের গ্রামে নাকি দুইটি বাড়ি পাকবাহিনী পুড়িয়ে দিয়েছে। এরও সঠিক কোনো খবর পাচ্ছি না। বাড়ির এবং আপনাদের খবর নেওয়ার জন্য মুক্তিবাহিনীর একজন গেরিলা পাঠিয়েছিলাম। সেও এখন পর্যন্ত ফিরে আসে নাই।

যাক, বর্তমানে দেশের এবং আপনাদের কী হাল অবস্থা পত্রবাহকের নিকট তা অবশ্যই বিস্তারিত বলে অথবা চিঠি লিখে দিবেন। পত্রবাহক আমাদের খুবই বিশ্বস্ত ও অন্তরঙ্গ লোক। হয়তো চিনতেও পারেন। তার আব্বা ঢাকার প্রটোকল অফিসার জনাব ওবায়দুর রহমান খান, তাড়াইল থানার পুরুরা গ্রামে তার বাড়ি। তারা মিঞা চেয়ারম্যান সাহেব টাকাটা দিয়েছেন কি না জানি না। যদি দিয়া থাকেন তবে পত্রবাহকের নিকট এক হাজার টাকা অবশ্যই দিয়া দিবেন। আর যদি না দিয়া থাকেন তবে অন্তত কমপক্ষে ছয়শত টাকা যে প্রকারেই হোক দিয়া দিবেন। এ-টাকাটা আমার নয়। এই সময়েই আমাকে এই দেনা মিটাতে হবে নতুবা আমার মান-ইজ্জতের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াবে। আর যদি আপনি এখানে এসে কারবার করতে চান তবে বর্ডারের নিকট বাংলাদেশ সরকার একটি নতুন বাজার বসিয়েছে। বাজারটি খুব চালু হয়েছে। যেকোনো কারবার এতে করা যাবে। বাজারে আমি একটি (...) বলেছি। আপনি যদি আসতে চান তাহলে জানাবেন। হাসেম উদ্দিনের জন্য কোনো চিন্তা করবেন না। সে ভালোই আছে। আর একটি খবর। সম্ভব হলে সত্রদরিয়ার ফুলু মিঞাকে জানিয়ে আসবেন। হাত্রাপাড়ার একটি ছেলে, নাম নুরুল ইসলাম। পিতা আ. মজিদ উ. মানী হুসেন। ট্রেনিং শেষ করে আসবার পথে খাসিয়া পাহাড়ে গাড়ি উল্টে যাওয়াতে তার মৃত্যু হয়েছে। এখানে তাকে যথারীতি দাফন করা হয়েছে। (অসমাপ্ত)

চিঠি লেখক ও প্রাপকের নাম পাওয়া যায়নি।

সংগ্রহ : মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর থেকে।

২৭/০৯/৭১

প্রিয় কমরেড মঞ্জুর,

আশা করি এত দিনে আপনারা আপনাদের ট্রেনিং শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। এখনো আপনাদের ট্রেনিং সম্বন্ধে সমস্ত খবর জানিতে পারি নাই, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আপনাদের এই সাফল্যজনক প্রত্যাবর্তনে আপনিসহ আপনাদের সকলকে অভিনন্দন জানাইতেছি। আপনাদের সহিত দেখা করিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করিতেছি। আরও কয়েক দিন পরও হয়তো দেখা করা সম্ভব হইবে না। যাহা হউক, দেখা হইলে সমস্ত কিছু জানা যাইবে এবং তাহার ফলে আমাদেরও কিছুটা অভিজ্ঞতা হইবে। প্রথম Batch-এর ব্যাপারেও কতকগুলি অভিজ্ঞতা হইয়াছে কিন্তু সেগুলি খুব বেশি ভালো নয়।

আশা করি আপনারা সকলেই সুস্থ আছেন। আপনাদের খবর জানিবার জন্য খুবই উদগ্রীব আছি। সম্ভব হইলে একখানা চিঠি দিবেন।

আমি একপ্রকার ভালো আছি। আমার জন্য কোনো চিন্তা করিবেন না। আপনি যে Horlicks (...) দিয়াছিলেন তাহা বেশ কিছুদিন খাইয়াছি।

আপনারা আমার ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করিবেন।

জ্ঞান চক্রবর্তী

চিঠি লেখক : জ্ঞান চক্রবর্তী, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা।

চিঠি প্রাপক : মুক্তিযোদ্ধা মনজুরুল আহসান খান। তিনি বর্তমানে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : মনজুরুল আহসান খান।

NOTES

সোনাটোলা, ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

প্রিয়তম স্বামী,

সালাম নিয়ো এবং ভালোবাসা। জাহান ভাই-এর হাতে একটা চিঠি পাঠিয়েছ। চিঠিটা পড়ে বেশ কিছুদিন পর ছিঁড়ে ফেলেছি রাজাকারদের ভয়ে। কারণ রাজাকাররা ২৪ ঘণ্টা আমাদের বাড়ি পাহারা দিচ্ছে—তোমাকে ধরার জন্য। তোমার দ্বিতীয় সন্তানের বয়স যখন ৬ দিন, তখন তোমার চিঠিটা পাই। তুমি লিখেছিলে আমি বেঁচে থাকি তোমার গর্ব তোমার স্বামী। বাংলাদেশকে ছিনিয়ে আনব। আমি ছুটোছুটি করতে থাকি। প্রচণ্ড কষ্ট বোঝাতে পারব না। আমি যেদিন তোমাদের বাড়ি থেকে আমার বাবার বাড়ি আসি, সেদিন ছিল ১৪ই জুলাই। সেদিন তুমি বাড়িতে ছিলে না। বুঝেছিলাম তুমি অস্থির আছ এবং বেশ কয়েক মাস ধরে লুকিয়ে থাকছ এবং অস্থিরতার মধ্যে থাকছ। কিন্তু আমাকে কিছু বলো না। বুঝতে পারতাম তুমি যুদ্ধে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছ। আমার বাবার বাড়িতে আসার কয়দিন পর বাবুর জন্ম হলো, ২১শে জুলাই। আশা করেছিলাম তুমি আসবে। তার বদলে এল চিঠি। আগামীকাল আমি শ্বশুরবাড়ি অর্থাৎ তোমাদের বাড়ি যাব। রাজাকারদের অত্যাচারে। জাহান ভাই-এর মাধ্যমে খবর পেতাম। তুমি বেঁচে আছ। ওখানে খবর পাব কীভাবে? তাই লিখছি।

তোমার আড়াই বছরের বড় ছেলে সব সময় পতাকা হাতে নিয়ে জয় বাংলা বলতে থাকে আর রাজাকাররা ধমক দেয়। আব্বা ছেলের মুখ চেপে ধরে, ছেলে ছটফট করতে থাকে আর বলে, নানু, আমাকে ছেড়ে দাও এবং বলে বাংলাদেশ জয় হোক। রাজাকাররা আব্বাকে বলে, তোমার জামাই তোমার বাড়িতে আসে, তোমাকে ধরিয়ে দিব। তোমার বাড়ি পুড়িয়ে দিব। এই সমস্ত কারণে আব্বাকে পাঠিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। আল্লাহর কাছে দোয়া করি, দেশ স্বাধীন করে ফিরে এসো সুস্থ দেহে।

ইতি

তোমার কদবানু আলেয়া

চিঠি লেখক : কদবানু আলেয়া। মুক্তিযোদ্ধা আবদুর রাজ্জাকের স্ত্রী।

চিঠি প্রাপক : মুক্তিযোদ্ধা আবদুর রাজ্জাক।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : এবিএম কাইসার রেজা, সহকারী অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ, কুমারখালী ডিগ্রি কলেজ, কুমারখালী, কুষ্টিয়া। তিনি আবদুর রাজ্জাকের ছেলে।

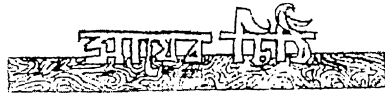

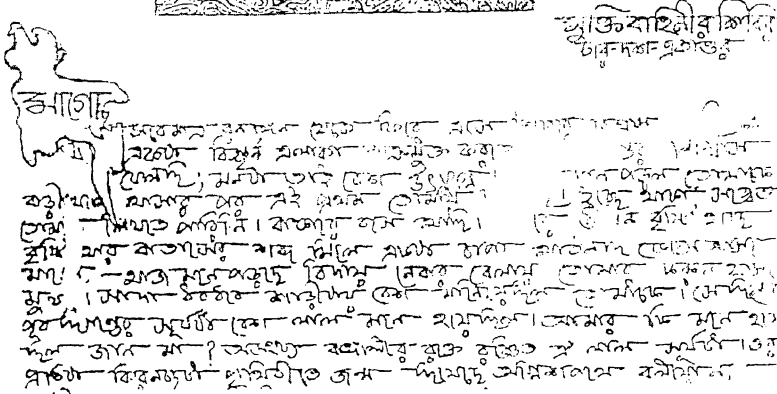

তারিখ : ০৪.১০.১৯৭১

মাগো,

সবেমাত্র রণাঙ্গন থেকে ফিরে এসে শিবিরে বিশ্রাম নিচ্ছি। একটা বিস্তীর্ণ এলাকা শত্রুমুক্ত করতে পেরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছি। মনটা তাই বেশ উৎফুল্ল। হঠাৎ মনে পড়ল তোমাকে। বাড়ি থেকে আসার পর এই প্রথম তোমাকে লিখছি। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও তোমায় লিখতে পারিনি। বাঙ্কারে বসে আছি। বাইরে ভীষণ বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টি আর বাতাসের শব্দ মিলে একটা চাপা আর্তনাদ ভেসে আসছে।

মাগো, আজ মনে পড়ছে বিদায় নেবার বেলায় তোমার করুণ হাসিমুখ। সাদা ধবধবে শাড়িটায় বেশ মানিয়েছিল তোমাকে। সেদিনের পূর্ব দিগন্তের সূর্যটা বেশ লাল মনে হয়েছিল। আমার কী মনে হয়েছিল জানো মা? অসংখ্য বাঙালির রক্তে রঞ্জিত ওই লাল সূর্যটা। ওর প্রতিটা কিরণচ্ছটা পৃথিবীতে জন্ম দিয়েছে অগ্নি-শপথে বলীয়ান, স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত এক একটা বাঙালি সন্তান। মাগো—তোমার কোলে জন্মে আমি ধন্য। শহীদের রক্তরাঙা পথে তোমার আদুরে ছেলেকে এগিয়ে দিয়েছে। ক্ষণিকের জন্যও তোমার বুক কাঁপেনি, স্নেহের বন্ধন—দেশমাতৃকার ডাক উপেক্ষা করতে পারোনি। মা, তুমি শুনে খুশি হবে যে তোমারই মতো অসংখ্য জননী তাঁদের স্নেহ ও ভালোবাসার ধন-পুত্র-স্বামী, আত্মীয়-সর্বস্ব হারিয়েও শোকে মুহ্যমান হয়নি; বরং ইস্পাতকঠিন মনোবল নিয়ে আজ অগ্নি-শপথে বলীয়ান।

মাগো—বাংলার প্রতিটি জননী কি তাঁদের ছেলেকে দেশের তরে দান *করতে পারে না—পারে না মা-বোনেরা ভাইয়েদের পাশে এসে দাঁড়াতে?* তুমিই তো একদিন বলেছিলে, সেদিন বেশি দূরে নয়—যেদিন এ দেশের শিশুরা মা-বাবার কাছে বিস্কুট-চকলেট না চেয়ে চাইবে পিস্তল-রিভলবার।

সেদিনের আশায় পথ চেয়ে আছে বাংলার প্রতিটি সন্তান, যেদিন বাংলার স্বাধীনতার সূর্য প্রতিফলিত হবে, অধিকারবঞ্চিত, শোষিত, নিপীড়িত, বুভুক্ষু, সাড়ে সাত কোটি বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষা। যে মনোবল নিয়ে প্রথম তোমা থেকে বিদায় নিয়েছিলাম, তা আজ শত গুণ বেড়ে গেছে। শুধু আমার নয়, প্রতিটি বাঙালি খুনের হানছে মাতোয়ারা। তাই তো বাংলার আনাচকানাচে এক মহাশক্তিতে বলীয়ান তোমার অবুঝ শিশুগুলোই আজ হানাদার বাহিনীকে চরম আঘাত হেনেছে—পান করছে হানাদার পশুদের তাজা রক্ত। ওরা মানুষ হত্যা করছে—আর আমরা পশু হত্যা করছি।
মা, মাগো। দুটি পায়ে পড়ি মা। তোমার ছেলে ও মেয়েকে দেশ ও জাতির ক্রান্তিলগ্নে ঘরে আটকে রেখো না। ছেড়ে দাও স্বাধীনতার উত্তপ্ত রক্তপথে। শহীদ হয়ে অমর হব; গাজী হয়ে তোমারই কোলে ফিরে আসব মা। মাগো—জয়ী আমরা হবই। দোয়া রেখো। জয় বাংলা।
তোমারই
দুলাল

চিঠি লেখক : মুক্তিযোদ্ধা দুলাল। তাঁর বিস্তারিত পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি। ফুলবাড়িয়ার সম্মুখসমরে তিনি আহত হন এবং পরে মারা যান। আহত হওয়ার সময় চিঠিটি তাঁর পকেটে ছিল। এটি পরে, মুক্তিযুদ্ধকালে প্রকাশিত *জাগ্রত বাংলা* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধকালে পত্রিকাটি ময়মনসিংহের ভালুকা থেকে প্রকাশিত হতো।

চিঠি প্রাপক : মা। তাঁর পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : এস এ কালাম, সম্পাদক, সাপ্তাহিক চরকা ও '৭১ মুক্তিযুদ্ধে *জাগ্রত বাংলা*। তাঁর বর্তমান ঠিকানা : ৫/৪৬ আউটার স্টেডিয়াম, ময়মনসিংহ।

সাপ্তাহিক
বাংলার বাণী

০৫/১০/৭১

শ্রদ্ধাবরেষু,

ভাই, সালাম জেনো, তোমার চিঠি পেয়েছি ১৪ তারিখে লেখা। কুচবিহারে যে চিঠিটা দিয়েছ, তা পাইনি। এর ভিতর হয়তো আমার আর একটা চিঠি পেয়ে গেছ। ওখানে রংপুরে আর গাইবান্ধায় দুটো চিঠি দিতে পাঠিয়েছিলাম। ও দুটো পাঠিয়ে দিয়ো। রংপুরের কোনো খোঁজখবর পাইনি। কাজেই মানসিকভাবে কী রকম চলছি বোঝ।

যাক, করার কিছু নেই। ভাই বা চিনুর চিঠি পাইনি অনেক দিন। আমি খোঁজ নিবার চেষ্টা করছি। তুমি এখনো কিছু ঠিক কোরো না কী করবে। তবে দেশে ফিরবার চেষ্টা একেবারেই করবে না। কদিন আগেই বিদেশ থেকে কজন শিক্ষক আর রেলওয়ের এক ডাইরেক্টর দেশে ফেরার সাথে সাথে প্রাণ হারিয়েছেন করাচিতেই। সমাধানের কোনো আলো দেখা যাচ্ছে না।

তোমার ওপর একটা অনুরোধ, বন্ধুবান্ধবদের অনেকেই প্রাণ নিয়ে এ দেশে পালিয়ে এসেছে—দেশে তাদের কেউ কোনো খোঁজ জানেন না। তুমি ওদের বিরাট উপকার করতে পার। চিঠিগুলো ওদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিয়ো। কৃতজ্ঞ থাকবে ওরা।

আমাকে চিঠি দিয়ো। কীভাবে আমি আছি—তুমি চিন্তা করতে পার না। মানসিকভাবে ভেঙে পড়ার যা বাকি। এবং তোমার কাছ থেকে ছাড়া অন্য কোথা থেকেও চিঠি পাবার উপায় নাই। সাথের চিঠি কটার সানু মিয়া হেডমাস্টারের চিঠিটা আগে পাঠিয়ে দিয়ো। পরে চেয়ারম্যানের চিঠিটা পাঠিয়ো। প্রেরককে তোমার ঠিকানা না দেওয়াই ভালো। এমনি একটা কিছু লিখে দিয়ো।

ইতি
জীমু

চিঠি লেখক : জীমু, মুক্তিযোদ্ধা কে মুশতাক ইলাহী। জীমু ছদ্ম নাম। তাঁর পিতার নাম : খোন্দকার দাদ ইলাহী। ঠিকানা : ধাপ, মেডিকেল মোড়, রংপুর।
চিঠি প্রাপক : ভাই; কে. মউদুদ ইলাহী।
চিঠিটি পাঠিয়েছেন : ড. কে. মউদুদ ইলাহী; প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, ঢাকা। তিনি মুক্তিযোদ্ধা কে মুশতাক ইলাহীর ভাই।

১১/১০/৭১

স্নেহের শামীম,

কারও কোনো বিপদে এখন আর এক পয়সার সাহায্যও আমার পক্ষে করা সম্ভব নয়। এ অবস্থা আমার কাছে অসহ্য।

সারা জীবন পরিশ্রম করে আজ বলতে গেলে একেবারে নতুন করে সংসারযাত্রা শুরু করতে হচ্ছে। কোনো অপঘাতে যদি মৃত্যু হয়, জানি না কোনো অকূল পাথারে সকলকে ভাসিয়ে রেখে যাব। কোনো দিন স্বপ্নেও ভাবিনি যে, সংসারজীবনে এমনি করে পেছনে ফিরে যেতে হবে। এ বয়সে নতুন করে দুঃখ কষ্টের মধ্যে যাওয়ার মতো মনের বল আর অবশেষ নেই। যা হোক, তোমাকে আশীর্বাদ করি, জীবনে সত্য ও ন্যায়ের পথে থেকে সামনে এগিয়ে যাও। আমার বন্ধুবান্ধবের সম্পর্কে যে কথা লিখেছ, ওতে আমি বিস্মিত হইনি, কারণ আমি অনেকের বন্ধু হলেও কেউ আমার বন্ধু ছিল না। কারণ, এ সংসারে সকলেই স্বার্থের দাস, জীবনের মহত্ত্বের গুণাবলি কজনের আছে? আমার জীবনে অপরিচিত জন ছিল যারা, বিপদে-আপদে তারাই আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, পরিচিত কোনো বন্ধুজন নয়।

শুনে খুশি হলাম, তুমি *মানিকের স্নেহাস্পর্শে আছ। ওদের ক'জনকে আমি বরাবর স্নেহের নয়, শ্রদ্ধার চোখেই দেখেছি। ওকে আমার শুভেচ্ছা জানাবে।

ইতি

আব্বা

এগারোই অক্টোবর

উনিশ শ' একাত্তর

* সাইফউদ্দিন আহমদ মানিক

চিঠি লেখক : শহীদ বুদ্ধিজীবী সিরাজুদ্দীন হোসেন। দৈনিক *ইত্তেফাক*-এর প্রবীণ সাংবাদিক। ১৯৭১ সালের ১০ ডিসেম্বর আলবদর বাহিনী তাঁকে বাড়ি থেকে নিয়ে যায়, তারপর তাঁর আর খোঁজ পাওয়া যায়নি।

চিঠি প্রাপক : মুক্তিযোদ্ধা শামীম, পুরো নাম শামীম রেজা নূর। শহীদ সিরাজুদ্দীনের বড় ছেলে।

সংগ্রহ : *স্মৃতিপটে সিরাজুদ্দীন হোসেন* গ্রন্থ থেকে।

From
Major M M
PABNA

8/1 Lalmatia Bl
Dhaka
12 10

From
Major M. M. Hossain
PABNA

8/1 Lalmatia Block-D
Dhaka-7
12.10.71

খালা ও মমিন
আমাদের আন্তরিক স্নেহ ও দোয়া ভালোবাসা জানিবা। আজ ৬ মাস তোমাদের কোনো সংবাদ পাই না। তিন মাস পর জেনেছি তোমরা ও বাড়িতে আছ এবং ভালো আছ। প্রথম তিন মাস আমাদের কী অবস্থা হয়েছিল অনুমান করতে পার। যাক তোমরা বেঁচে আছ জেনে কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েছি। আমাদের মানসিক অবস্থা খুবই খারাপ। এপ্রিল মাসের প্রথমদিকেই আমার বাড়িঘর সম্পূর্ণভাবে পুড়িয়ে দিয়েছে। সমস্ত জিনিস পুড়ে গিয়েছে কিংবা লুট হয়েছে। আমরা সত্যিকারের সর্বহারা। অনেক বাড়িই পুড়ে গিয়েছে এবং সমস্ত বাড়িই লুট হয়েছে। মাঝে মাঝে ২/১ খানা ভাল আছে। অপূরণীয় ক্ষতি। স্মৃতিচিহ্ন সবই গিয়েছে। জামাকাপড় থেকে আরম্ভ করে যাবতীয় জিনিস নষ্ট হয়েছে। এমনকি শোয়ার মতো বিছানা, খাট ইত্যাদিও নাই। বাড়ি মেরামত করা ছাড়া বাড়িতে যাওয়ার উপায় নাই। বর্তমানে সাধুপাড়া বাসাতে থাকি, ওই দিকটা বেশি নষ্ট হয় নাই। এই ছয় মাস বহু জায়গায় থেকে বর্তমান তিন সপ্তাহ হলো এখানে আছি। লাভলুর চিঠি পেয়েছি, ভালো আছে। করিম ও গিনি ঢাকা এসেছিল। করিম গত ৩০/৯ করাচি গিয়েছে। টিটোও গিয়েছে। টুটুরা অনেক জায়গায় ছিল, বর্তমানে চিটাগাং আছে। বেবী ও পিয়া ৪॥* মাস ঢাকাতে।

* সাড়ে চার

গত মাসে ঢাকায় তুহিনের বিবাহ হয়েছে। ছেলে এমবিবিএস-ময়মনসিংহ জেলায় বাড়ি। হিরার শ্বশুর ও শালা আয়নাল গুলিতে মারা গিয়েছে। বাড়িঘর সব লুট হয়েছে। আমিনউদ্দীন অ্যাডভোকেট গুলিতে মারা গিয়েছে। ঘুটুর শ্বশুর, আনিসের শ্বশুর, তুহিনের বড় মামা ইত্যাদি ইত্যাদি মারা গিয়েছে। পল্টু মামাও মেহমানদের নিকট। আমরা প্রথমেই বাড়ি ছেড়ে দিয়ে জীবনে বেঁচে আছি। এই শুধু সান্ত্বনা। খোদা তোমাদের সবাইকে বাঁচিয়ে রাখুন, এই দোয়াই করি। ইমনের জন্য সব সময়ই মনে হয়, ও-ই সব সময় খেতে চাইত—এখন কত কষ্টই পাচ্ছে। মেয়ে হওয়ার সংবাদ যদিও পেয়েছি প্রথমে ঘুটু D.A.D. Rangpur Mr Momtaz শাহানা ও অন্যান্য ২/১ জনের নিকট কিছু কিছু সংবাদ পেয়েছিলাম। পরে হেলেনের চিঠিতে সব জানি। মাঝে মাঝে, এমনকি সপ্তাহে সপ্তাহে রফিকের নিকট লিখে আমাদের জানাবে। শুভেচ্ছা রইল। ইমনকে আমাদের প্রীতি ভালোবাসা জানাবে। খোদা হাফেজ।

আশীর্বাদক

তোমাদের আব্বা

১২.১০.১৯৭১

চিঠি লেখক : মেজর ডা. মোহাম্মদ মোফাজ্জল হোসেন।

চিঠি প্রাপক : মেরিনা ইসলাম ও মুক্তিযোদ্ধা মুজহারুল ইসলাম। মেরিনা ইসলাম ডা. হোসেনের কন্যা। ডা. হোসেন তাঁর কন্যা মেরিনাকে 'খালা' বলে সম্বোধন করতেন।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : মেরিনা ইসলাম।

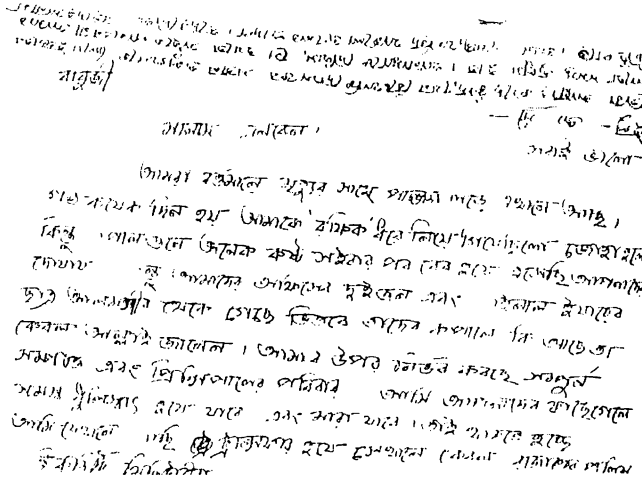

১৫.১০.৭১

বাবুজি,

আমার সালাম জানবেন। আশা করি, আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমরা বর্তমানে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে এখানে আছি। গত কয়েক দিন হয় আমাকে 'রফিক' ধরে নিয়ে গিয়েছিল জোহা হলে, কিন্তু কপালগুণে অনেক কষ্ট সইবার পর বের হয়ে এসেছি আপনাদের দোয়ায়। কিন্তু আমাদের অফিসের দুইজন এবং ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র আলমগীর থেকে গেছে ভিতরে। তাদের কপালে কী আছে, তা কেবল আল্লাহই জানেন। আমার ওপর নির্ভর করছে সম্পূর্ণ সম্পত্তি এবং প্রিন্সিপালের পরিবার। আমি আপনাদের কাছে গেলে সমস্ত ধূলিসাৎ হয়ে যাবে এবং মারা যাবে। তাই থাকতে হচ্ছে। আমি যেখানে আছি ট্রান্সফার হয়ে সেখানে কেবল রাজাকার, পুলিশ, শান্তি কমিটি, মিলিটারিরা আহত অবস্থায় আছে। ১৮টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৩টা বাদ দিয়ে বাদবাকি ভর্তি হয়ে আছে। এদের মধ্যে কাজ করা আর কচুর পাতার ওপর পানির মতো জীবন। রফিক একমাত্র লোক যে প্রধান শহরে সবচাইতে Active. আমার জন্য আপনি দোয়া করবেন, যেন শেষ অবধি বেঁচে থাকতে পারি স্ত্রী, পুত্র নিয়ে। চারদিকে কেবল মৃত্যু-বিভীষিকা। ঢাকা গিয়েছিলাম অফিসের কাজে, বর্তমানে ঢাকা বিস্ফোরণোন্মুখ শহর। বিধ্বস্ত, আতঙ্কগ্রস্ত, মৃত্যুর ফাঁদপাতা নগর। প্রতিদিন রাজশাহীর মতো সেখানে ২০-২৫ করে আহত আসছে। (বাঙালিদের সাথে বিহারিও) আলমডাঙ্গায় দাঙ্গা হয়ে গেল। সাজাদপুরের ১১৮টা মাস্টার গ্যাসে আক্রান্ত রোগী এসেছে, পাবনা আগুনে জ্বলছে পাটগুদামে। পাবনা, ঈশ্বরদী, রাজশাহী, নাটোরের ফায়ার ব্রিগেড পারছে না নিভাতে তিন দিন ধরে। নগরবাড়ী ছয়টার মধ্যে তিনটা ফেরি ডুবেছে। ঢাকায় কারফিউর মধ্যে রাস্তায় যুদ্ধ চলছে। ঘোড়ামারায় পাঁচজন মিলিটারি চাকুতে মারা গেল। কোর্টের কাছে সামাদ দারোগাসমেত সাতজন, জিপ উড়ে গেল। রাত ১০টার পর

অঘোষিত কারফিউ। হাড়ুপুর খোলাবনা অর্থাৎ কোর্ট হতে প্রেমতলী পর্যন্ত আগুনে পুড়ল। হাসপাতালে ১৪১ জন আহত, ২০০ জন মৃত। গওহাটা নদীর ওপার হতে ১৫ জন আহত এসেছে, হাসপাতালে স্থান নাই, মেডিসিন নাই। কেরোসিন, লবণ আকাশছোঁয়া দাম। গর্জ্জার কাছে বাবলাবনে, ফায়ার সার্ভিসের ছাদে, জোহা হলে, বড়কুঠিতে বিমানধ্বংসী কামান, প্রতিদিন মেয়েদের আর্তনাদ জেলখানার ভিতর। ৩০০ মেয়ে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুলের আছে সেখানে। বর্তমানে মেয়েরা ধারালো ব্লেড রাখছে কাছে এবং চরম সময় ব্যবহার করছে পশুর ওপর। শহরের বিভিন্ন স্থানে ২৫ জন শেষ হবার পর পশুরা এখন বন্ধ করেছে। শয়তানগুলো কেবল রাতে চার-পাঁচ জিপ ট্রাকে ৪০-৩০ মাইল বেগে পেট্রোল দিচ্ছে। ধরপাকড়, জোহা হলের বন্দীদের জবাই চলছে প্রতিদিন। হেনার বাড়ির পুরুষমানুষদের নিয়ে গেছে। আফ্রোজ এখন নরোজের পরিবারসমেত মারবার তালে আছে। এক এক দিন বহুদূরে মর্টার মেশিনগানের শব্দ শোনা যায়। বীভৎস মৃত্যু-বিভীষিকার শহর। রাজাকারদের মধ্যে আল-বদর বর্তমানে Active খুব। তারাবির নামাজের ওপর গুলি ২৫ শে রমজান আট রাকাতের সেজদায় মানিকচক ও নবীনগর, ১২ রাকাতের সময় জামালকলি, পারুলিয়া মসজিদে। রহনপুরে ইফতার করার জন্য বসে থাকা মুসল্লিদের ওপর গুলি চলেছে। মোমতাজ আলী বাদে ১৮ জন শহীদ হয়েছেন। ঈদের দিন পাড়ার মসজিদে নামাজ হয়েছে। ঈদগাহের নামাজিরা পালিয়ে এসেছে মিলিটারি ঘেরাও হবার আগে। নওগাঁয় নামাজ হয়নি। ঢাকা-রাজশাহী বিচ্ছিন্ন। শরদহ হতে ২২ জন (তার মধ্যে মারা গেল নয়জন) মিলিটারি এসেছে।

আমরা বর্তমানে মৃত্যুর খুব কাছাকাছি। এত কাছে যে আমরা মৃত্যুকে যেন দেখতে পাচ্ছি প্রতি মুহূর্তে। শীতে কষ্ট পাচ্ছি, একটা সোয়েটার যেকোনো দামেরই হোক (একটু ভালো) নীল অথবা সবুজ রঙের পাঠিয়ে দিবেন, আর মোজা জোড়া পাঠাবেন। বাবুজি, এই চিঠি ডাঃকে দেখাবেন। দোয়া করতে বলবেন। মনে করেন আমি জগলুর মতো হয়েছি অথবা রমজানের মতো।

রাজ ইলু-আব্বাসী, তোরা আল্লার কাছে কাঁদ। যেন বেঁচে থাকি দোয়া কর সজল ও লুৎফাকে নিয়ে ইজ্জতের সাথে সমস্ত জুলুম হতে। খালাম্মাকে দেখিস, তিনি হয়তো সইতে পারবেন না আমার চিঠি পড়ে। বাবন, ফয়েজ, ফরিদ থাকল বংশের প্রদীপ। ওদের দেখিস। বড়দের সালাম।
বাবলু

চিঠি লেখক : শহীদ মুক্তিযোদ্ধা বাবলু। পুরো নাম ফেরদৌস দৌলা বাবলু। ১৯৭১ সালের ২৬ নভেম্বর তিনি শহীদ হন।

চিঠি প্রাপক : বাবুজি (বাবা), ফিরোজ দৌলা খান। মালোপাড়া, রাজশাহী।

সংগ্রহ : আমিনুল আকরাম

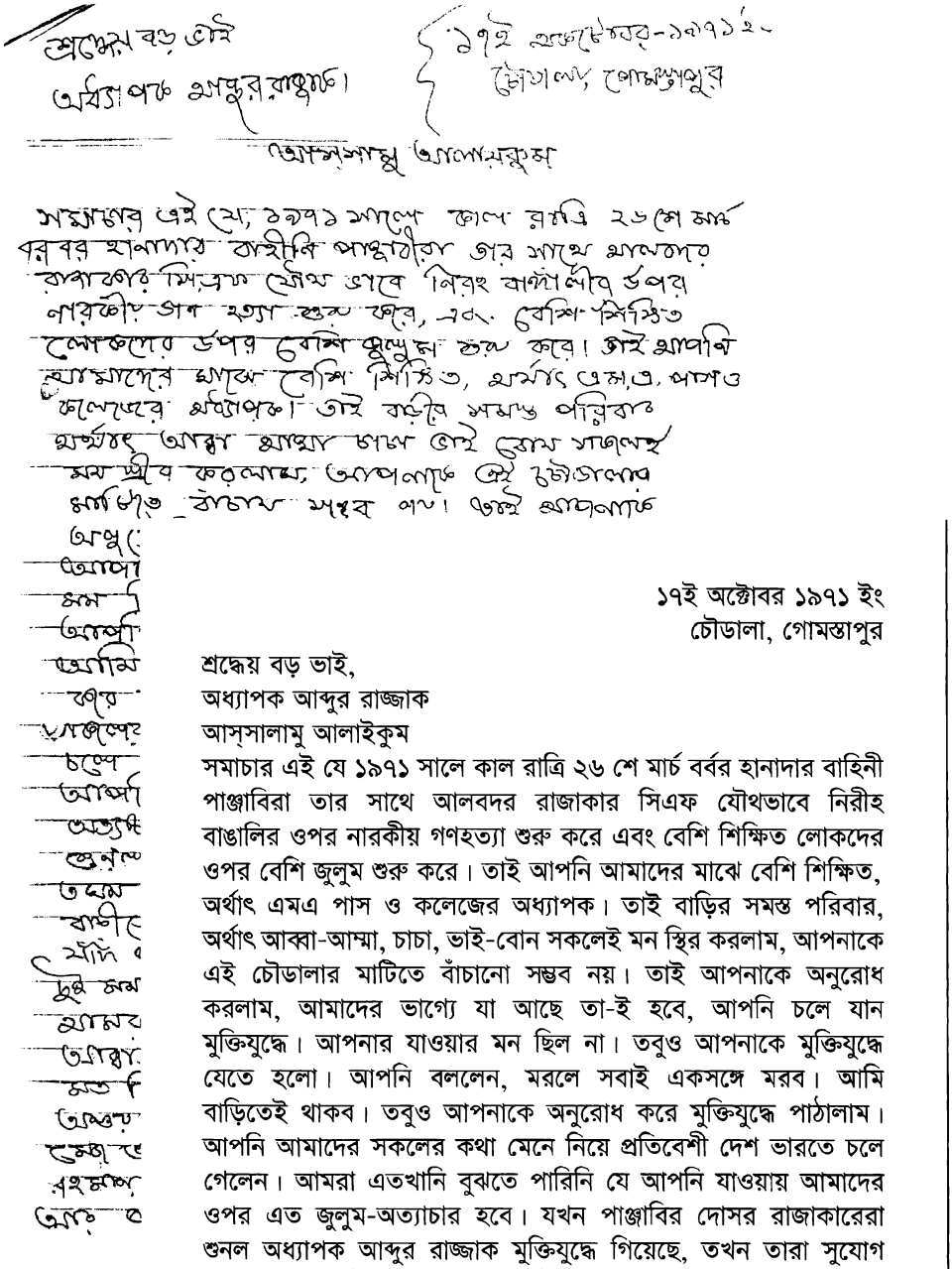

১৭ই অক্টোবর ১৯৭১ ইং
চৌডালা, গোমস্তাপুর

শ্রদ্ধেয় বড় ভাই,
অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক
আস্‌সালামু আলাইকুম

সমাচার এই যে ১৯৭১ সালে কাল রাত্রি ২৬ শে মার্চ বর্বর হানাদার বাহিনী পাঞ্জাবিরা তার সাথে আলবদর রাজাকার সিএফ যৌথভাবে নিরীহ বাঙালির ওপর নারকীয় গণহত্যা শুরু করে এবং বেশি শিক্ষিত লোকদের ওপর বেশি জুলুম শুরু করে। তাই আপনি আমাদের মাঝে বেশি শিক্ষিত, অর্থাৎ এমএ পাস ও কলেজের অধ্যাপক। তাই বাড়ির সমস্ত পরিবার, অর্থাৎ আব্বা-আম্মা, চাচা, ভাই-বোন সকলেই মন স্থির করলাম, আপনাকে এই চৌডালার মাটিতে বাঁচানো সম্ভব নয়। তাই আপনাকে অনুরোধ করলাম, আমাদের ভাগ্যে যা আছে তা-ই হবে, আপনি চলে যান মুক্তিযুদ্ধে। আপনার যাওয়ার মন ছিল না। তবুও আপনাকে মুক্তিযুদ্ধে যেতে হলো। আপনি বললেন, মরলে সবাই একসঙ্গে মরব। আমি বাড়িতেই থাকব। তবুও আপনাকে অনুরোধ করে মুক্তিযুদ্ধে পাঠালাম। আপনি আমাদের সকলের কথা মেনে নিয়ে প্রতিবেশী দেশ ভারতে চলে গেলেন। আমরা এতখানি বুঝতে পারিনি যে আপনি যাওয়ায় আমাদের ওপর এত জুলুম-অত্যাচার হবে। যখন পাঞ্জাবির দোসর রাজাকারেরা শুনল অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছে, তখন তারা সুযোগ পেল, তারপর পাঁচজন রাজাকার বাড়িতে এসে অন্যায় জুলুম শুরু করল। যদি জানে বাঁচতে চাস, তবে একটা খাসি এবং দুই মণ চাল দে এবং ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা দে। আমরা পিকনিক করব। তখন সঙ্গে সঙ্গে

আব্বা ও চাচা খাসি-চাল-টাকা দিয়ে সেদিনের মতো বিদায় দিলেন। তার পর থেকেই দুই-চার দিন অন্তর টাকা-পয়সা, চাল-ডাল নিয়ে যায়। তখন মেজো ভাই থাকতে না পেরে, আমাকে বলল, ফজলুর রহমান, তুই রাজাকারে যোগদান কর, না হলে আর জান বাঁচবে না। তখন আমি বললাম এখন রাজাকারে যোগদান করলে তারা আমাদেরকে আরও সন্দেহ করবে। আমাদের ওপর আরও জুলুম শুরু হবে। ভাগ্যে যা আছে তা-ই হবে, আমি যোগদান করলাম না। আল্লাহর ওপর ভরসা করে দিন কাটাতে লাগলাম। তারপর বড় বাগানের সমস্ত বাবলার গাছ কেটে তারা মরিচা বানাতে শুরু করল। আপনি তো জানেন প্রায় ১০০ গাছ ছিল। কিছুই বলতে পারিনি। এবং সে বাগানেই আমাদের ইটের ভাটা ছিল, সে ভাটার ইটে মরিচা করেছে। বাদবাকি ইট লুটপাট করে বিক্রি করে দিয়েছে, এখন পর্যন্ত কিছুই বলার সাহস পাইনি। এইভাবে তাদের মন জোগাই আর দিন যায়। তারপর অক্টোবর মাস হতে তারা গ্রামের প্রায় ১০ জন নিরীহ লোককে ধরে নিয়ে গিয়ে রহনপুরে পাঞ্জাবিদের ক্যাম্পে বন্দী করে রাখে। তিন দিন পর পাঞ্জাবিরা রাত্রিবেলায় চোখ বেঁধে গুলি করে নদীতে ভাসিয়ে দেয়। তার দু-তিন দিন পর পাঞ্জাবিরা গোমস্তাপুরে সমস্ত হিন্দুদের ধরে নিয়ে নদীর ধারে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করে। তারপর রাজাকার পাঞ্জাবিরা যৌথ বাহিনী বড় জামবাড়িয়া ছোট জামবাড়িয়ায় হাজার হাজার বাড়িঘর লুটপাট করে। এবং নিরীহ মানুষ হত্যা করে। তার কিছুদিন পর পাঞ্জাবিরা কাসিয়াবাড়ী বোয়ালিয়া অপারেশন করে। সেখানে তারা এমন গণহত্যা চালায় যে নদী দিয়ে শত শত লাশ আমরা ভেসে যেতে দেখেছি। আর কী লিখব, এই করুণ কাহিনী লিখে শেষ করা যাবে না। আপনি আমাদের জন্য দোয়া করেন, যেন আমরা আল্লাহর রহমতে কোনোরকমে জানে বাঁচতে পারি। আমাদের মনে প্রবল আশা যে শীঘ্রই (...) হবে। আপনাকে আল্লাহর হাতে সঁপে দিয়েছি। মরলে শহীদ, বাঁচলে গাজি হয়ে ফিরে আসবেন। এই দোয়া রাখি। ত্রুটি মার্জনীয়।

ইতি

আপনার ছোট ভাই

ফজলুর রহমান

চিঠি লেখক : ফজলুর রহমান, গ্রাম : হাউসনগর, পো : চৌডালা, জেলা : রাজশাহী। মুক্তিযোদ্ধা আবদুর রাজ্জাকের ছোট ভাই।

চিঠি প্রাপক : মুক্তিযোদ্ধা আবদুর রাজ্জাক। তিনি তখন ৭ নম্বর সেক্টরের অধীন ভোলাহাট এলাকায় যুদ্ধরত ছিলেন।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : এবিএম কাইসার রেজা, সহকারী অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ, কুমারখালী ডিগ্রি কলেজ, কুমারখালী, কুষ্টিয়া। তিনি মুক্তিযোদ্ধা আবদুর রাজ্জাকের ছেলে।

২০.১০.৭১

শ্রদ্ধেয় গাফ্‌ফার সাহেব—

গত ১২/১০ তারিখে এবং ১৩/১০ তারিখে আমার লেখা যে Report এবং ছবি যুগান্তর কাগজে ছাপা হয়েছিল, আপনার কথামতো তা পাঠালাম। রিপোর্টের মধ্যে অনেক ভুলভ্রান্তি আছে জানি, তবু যা সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম সেটাই লিখেছিলাম। আপনাদের সহযোগিতা পেলে ভবিষ্যতে পূর্ণাঙ্গ সংবাদ পাঠাতে পারব বলে আশা করি। সেদিন আপনার কাছ থেকে যে সংবাদগুলি নিয়ে এসেছি, তা দু-চার দিনের মধ্যেই কাগজে পাঠাব। যদি Time to time আপনার বিভিন্ন sector-এর operation-এর খবর পাঠান তাহলে ভালো হয়। আশা করি সকলেই আশাবাদী মন নিয়ে এগিয়ে চলেছেন। আপনাদের সকলের জন্য আমার বিপ্লবী অভিবাদন রইল।

ইতি—

ভবদীয়

প্রফুল্লকুমার গুপ্ত

চিঠি লেখক : প্রফুল্লকুমার গুপ্ত। ১৯৭১ সালে তাঁর ঠিকানা : গোরাবাজার, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। তিনি তখন কলকাতা থেকে প্রকাশিত *যুগান্তর* পত্রিকার স্থানীয় প্রতিনিধি ছিলেন।

চিঠি প্রাপক : মুক্তিযোদ্ধা এ গাফ্‌ফার খান। তিনি চাঁপাইনবাবগঞ্জ এলাকার মুক্তিবাহিনী দলের কমান্ডার ছিলেন। তাঁর তখন ঠিকানা ছিল প্রযত্নে : শ্রী আনন্দমোহন মজুমদার, গ্রাম : কাজীপাড়া, ডাকঘর : কাজীপাড়া, মুর্শিদাবাদ।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : প্রাপকের ছেলে মো. রাকিবুর রহমান খান, উপব্যবস্থাপক (প্রশাসন), নাটোর সুগার মিলস্, নাটোর।

২১.১০.৭১

প্রিয় স্যার,

সবিনয় নিবেদন এই, আমরা ১৪/০৯/৭১ ইং তারিখে ভালুকায় পৌঁছিয়াছি। পথে পাকফৌজের ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়িয়া ৫-৬ ঘণ্টা ফাইট হয়। ১০ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হইয়াছে, ১৭ জন পাকসেনা ও রাজাকার নিহত হইয়াছে। আমি অনেক পূর্বেই সংবাদ দিবার চেষ্টা করিয়াছি। শওকত আলীকে পাঠাইয়াছিলাম। সে পথিমধ্যে রাজাকারের হাতে ধরা পড়িলে তাহাকে কৌশলে মুক্ত করা হইয়াছে। আমি আফছারউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে হাতিয়া মুক্তিফৌজের ডাক্তার হিসাবে কাজ করিতেছি। আমাদের এখানে ১৮০/১৯০ মাইল পর্যন্ত মুক্ত এলাকা। আমি আসিয়া অনেক ছেলে পাঠাইলাম। আমি দেশে গিয়া দেশের খুব শোচনীয় অবস্থা দেখিয়াছি। আমরা ওই সময় দেশে পৌঁছিতে না পারিলে বহু লোক রাজাকারে চলিয়া যাইত। আমাদের ভালুকায় মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্র ছাড়িয়া অনেকেই আত্মগোপন করিয়াছিল। আমার বাড়িঘর বলিতে কিছুই নাই। পাকসেনারা পোড়াইয়া ফেলিয়াছে। নিবেদন ইতি।

আপনার বিশ্বস্ত

ডা. .....উদ্দিন

সংগ্রহ : বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ : দলিলপত্র থেকে।

Patgram, Rangpur
Bangladesh
25/10/71 10 p.m.

Dear Tauhid,
First let me tell you [that] I am writing to you from a liberated area of Bangladesh. The Indian border is almost 18 (eighteen) miles from here. I am breathing the free air of a liberated place and by God it feels good. Liberated this place 2 weeks back.
It is sometime around 10 o'clock in the evening. I am lying in my bed inside a hut. My bed is a wooden platform dug in about two feet below the floor level. The earth raised all around me to give protection from the bullets & shells. One lamp burning with the min. light. My 'friends' the Punjabis are only 600 yards away. The sons-of-bitches have not shelled on us today/night, but I have a feeling they will any time, now, they usually do at this time. The idiots did not let us sleep last night. Fired about 40 shells, couldn't land a single one on us, – marksmanship! So we fired about 50 shells today on them. Intelligence report received one 'dog' killed, – what marksmanship! Actually these kind of funny things happen quite often. Because once you are inside the bunker, you are safe. Unless one unlucky one lands right on yours top, – which is very rare.

I am writing to you because after a long time I remembered the good old days. I remembered my friends, my family and above all my Dacca. You know Tauhid, these days I don't evcn get much time to think about the old times. I really don't know when I shall get my next chance to write to you. The place I wrote to you last is about 150 miles from here.

How's London? Must be very big and glamorous. It I can dodge their bullets and stay alive I'll see you there. Fix a nice little place for me, will you?

Have you written to my homc? Please take a little more trouble. Ask them to write to you about there welfare so that you can write to me about them. It is six long months I havc no news of them.

My ad--
LT. Ashfaqus SAMAD
Hq. Sector-6
C/o Postmaster
PO. CHANGRABANDHA
D.T. COOCHBIHAR
INDIA

How's Rukhsana and everybody at home. Givc them my best. Please give my best to Najmul also. Answer fast.

Love
Ashfi

চিঠি লেখক : মুক্তিযোদ্ধা শহীদ আশফাকুস সামাদ বীর উত্তম; পুরো নাম আবু মইন মোহাম্মদ আশফাকুস সামাদ। তাঁর বাবার নাম আজিজুস সামাদ। মার নাম সাদেকা সামাদ। আশফাকুস সামাদ ১৯৭১ সালের ২০ নভেম্বর কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙ্গামারী উপজেলার রায়গঞ্জ এলাকার জয়মনিরহাটে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে শহীদ হন।

চিঠি প্রাপক : তৌহিদ; পুরো নাম তৌহিদ সামাদ। তিনি বর্তমানে ব্যবসায়ী। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড ও সাভার টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড। তাঁর বর্তমান ঠিকানা : ৪২ দিলকুশা বা. এ., ঢাকা।

সংগ্রহ : মেজর (অব.) কামরুল হাসান ভূঁইয়া।

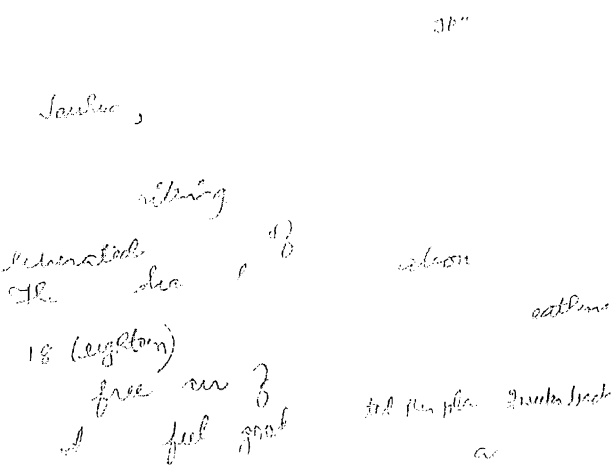

পাটগ্রাম, রংপুর
বাংলাদেশ
২৫/১০/৭১ রাত ১০টা

প্রিয় তৌহিদ,

প্রথমেই বলে নিই যে বাংলাদেশের মুক্ত এলাকা থেকে তোমাকে লিখছি। এখান থেকে ভারতীয় সীমান্ত প্রায় ১৮ মাইল দূরে। আমি মুক্ত ভূমিতে নিঃশ্বাস নিচ্ছি, খোদার ইচ্ছায় খুব ভালো লাগছে। এ জায়গাটি মুক্ত হয়েছে দুই সপ্তাহ আগে।

এখন রাত দশটার কাছাকাছি সময়। একটা কুঁড়েঘরে আমি আমার বিছানায় শুয়ে আছি। মেঝে থেকে দুই ফুট নিচে খোঁড়া গর্তের মধ্যে কাঠের পাটাতনে পাতা বিছানা। বুলেট ও গোলা থেকে রক্ষার জন্য আমার চারদিকে মাটির দেয়াল। একটা অল্প আলোর কুপি জ্বলছে। আমার 'বন্ধু' পাঞ্জাবিরা মাত্র ৬০০ গজ দূরে। কুত্তার বাচ্চাগুলো আজ দিন/রাতে গোলাগুলি করেনি। আমার মনে হচ্ছে যেকোনো সময় তারা সেটা শুরু করতে পারে। হয়তো এখনই, তারা সাধারণত এ রকম সময়ে গোলাগুলি করে। গাধাগুলো গত রাতে আমাদের ঘুমাতে দেয়নি। প্রায় ৪০টা গোলা নিক্ষেপ করেও আমাদের ওপর ফেলতে পারেনি। লক্ষ্যভেদের কী নমুনা! আমরা আজ ওদের ওপর ৫০টা গোলা নিক্ষেপ করেছি। গোয়েন্দা তথ্যে জানা গেছে, একটা 'কুকুর' মারা গেছে। কী অসামান্য লক্ষ্যভেদ! আসলে এ রকম হাস্যকর ঘটনা মাঝে মাঝে ঘটে। তুমি যদি বাংকারে থাকো তাহলে নিরাপদ থাকবে। নয়তো ভাগ্য খারাপ হলে একটা গোলা এসে তোমার ওপর পড়তে পারে। তবে এর সম্ভাবনা খুবই কম।

অনেক দিন পর পুরোনো মধুর দিনগুলোর কথা মনে পড়ল বলে তোমাকে লিখতে বসেছি। আমার মনে পড়ছে বন্ধুদের কথা, পরিবারের কথা,

সর্বোপরি আমার ঢাকা শহরের কথা।
তুমি জানো তৌহিদ এই দিনগুলোতে পুরোনো দিনের কথা ভাবার মতো সময় পাইনি। সত্যি সত্যি জানি না, আবার কখন তোমাকে লেখার সুযোগ পাব। শেষ যেখান থেকে তোমাকে লিখেছি সেখান থেকে এই স্থানের দূরত্ব ১৫০ মাইল।
লন্ডন কেমন? খুব বড় আর জমকালো নিশ্চয়ই। ওদের বুলেট এড়িয়ে যদি বাঁচতে পারি তাহলে তোমার সঙ্গে ওখানে দেখা করব। আমার জন্য একটা সুন্দর ছোট জায়গা ঠিক কোরো। করবে?
তুমি কি আমার বাড়িতে চিঠি লিখেছিলে? আরেকটু কষ্ট করো। তাদের বলো, তারা যেন তোমাকে চিঠি লিখে তাদের কুশল জানায় যাতে তুমি আবার সেটা আমাকে জানাতে পার। ছয় মাস চলে গেল, আমি তাদের কোনো খবর পাই না।
আমার ঠিকানা
লেফট্যানান্ট আশফাক সামাদ
হেডকোয়ার্টার সেক্টর ৬
প্রযত্নে : পোস্টমাস্টার
চ্যাংড়াবান্ধা
জেলা : কুচবিহার
ভারত

বাসায় রুখসানা ও আর সবাই কেমন আছে? তাদের আমার শুভেচ্ছা জানিয়ো। নাজমুলকেও আমার শুভেচ্ছা দিয়ো। দ্রুত উত্তর দিয়ো।
ভালোবাসা
আসফি

*পূর্ববর্তী ইংরেজি চিঠির অনুবাদ

২৮-১০-৭১

ডালু এমএফ
হেডকোয়ার্টার

জনাব মেজর সাহেব
আমার ছালাম নেবেন। পর সমাচার এই যে গত ২৭-১০-৭১ বিকেল তিন ঘটিকার সময় একটি পার্টি নিয়ে পেট্রোলে যাই এবং ফরেস্ট অফিসের সামনে বড় উঁচু একটি পাহাড়ে উঠে অনেক নতুন ও পুরোনো বাংকার দেখতে পেলাম। আর ফেফারি এলাকায় একটি পাহাড়ে তাদের ও পি পোস্ট তৈরি করছে এবং টেলিফোনের তার লাগিয়ে মাটির সঙ্গে ফেলে তৈরি করেছে। ওরা সব ঠিক করে যাওয়ার পর আমরা ওই টেলিফোনের তার সন্ধ্যা সাতটায় ৩৩ গজ কেটে আনি এবং ওরা যখন জানতে পারল আমরা ওদের ফোন লাইন কেটে দিয়েছি তখন আমাদের ওপর ওরা ফায়ার দেয় এবং আমরা ১৫০ রাউন্ড গুলি ফায়ার দিই। স্টেনগানে ৫০ রাউন্ড ফায়ার দিয়ে ফিরে আসি। খোদার ফজলে আমাদের কোনো ক্ষতি হয়নি। আমরা নিরাপদেই ওদের টেলিফোন লাইন নষ্ট করে ৩৩ গজ তার নিয়ে এসেছি এবং ওই তার আপনাদের এখানে পাঠালাম।

ইতি
স্বাঃ মোহাম্মদ আলী
পানীহান্তা এমএফ ক্যাম্প

সংগ্রহ : বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র থেকে।

৩০/১০/৭১

আজিজ ভাই,

সালাম নিবেন ও আর সবাইকে দিবেন। পাকিস্তান মিলিটারির পাল্লায় আমরা পড়েছি, না পাক মিলিটারি আমাদের পাল্লায় পড়েছে, তা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। তবে ওদের সঙ্গে আমাদের প্রায়ই দেখা হচ্ছে এবং সামনে আরও হবার সম্ভাবনা আছে বুঝতে পারছি। ২৬-১০-৭১ তাং চরকুলিয়ার যুদ্ধে আমরা সর্বমোট ১৫৮ (একশত আটান্ন) জন হানাদারকে মেরেছি এবং প্রায় এক শতাধিককে জখম করেছি। কোথাও থেকে সাহায্য পাইনি। যাক, আতি ভাইকে আপনার কাছে পাঠালাম। সাচিয়াদহ হাট আদায় না করলে আমাদের সত্যিকারে নানা রকম অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। তাই খাজা মিয়াকে বলবেন, যাতে আমাদের লোক হাট আদায় করতে গেলে কোনো রকম বাধা-বিপত্তি না করে। ভালো আছি। এইমাত্র দুঃসংবাদ পেলাম। তাই আবার চরকুলিয়া দৌড়াচ্ছি।

ইতি

ফহম উদ্দিন আহমেদ

জোনাল অফিসার

নর্থ খুলনা জোন

সূত্র : বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ : দলিলপত্র থেকে।

০১.১১.১৯৭১

প্রিয় ছোট ভাই,

আমার স্নেহ নিয়ো। তোমার চিঠি পেয়ে বেশ উদ্বিগ্ন হলাম। তোমার যে তিন বোনের কথা লিখেছ, ওদের নাম পাঠাও। বিশ্বাসঘাতকদের একমাত্র শাস্তি মৃত্যু। ডাক্তার এবং সিরাজ সম্পর্কে আমাদের এই অভিমত। তবে যদি সম্ভব হয় ওদের যেভাবে পার আমাদের কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা কোরো। না পারলে সিদ্ধান্ত তোমরাই নেবে।

আগে যে নির্দেশাদি দিয়েছি, তা ঠিকমতো পালন করছ না। সকল নির্দেশ ভালো রকম বুঝে পালন করতে চেষ্টা করবে।

তোমাদের জন্য ডিম এবং মুরগি সত্বর পাঠাবার ব্যবস্থা করব। সময় কিছু লাগবে। যেসব ব্যাপার জানতে চেয়েছি, তা সত্বর জানাবে। তোমার সাংসারিক খরচের জন্য ১০০ (একশত) টাকা পাঠালাম। আহারের সংস্থান অবশ্যই স্থানীয়ভাবে করতে হবে। নখলার বড় বোন দুজনকে যোগাযোগ করতে বোলো। ওরা নীরব কেন?

আমরা ভালো আছি। তোমাদের কুশল কামনা করি।

ইতি

বড় ভাই

সূত্র : বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ : দলিলপত্র।

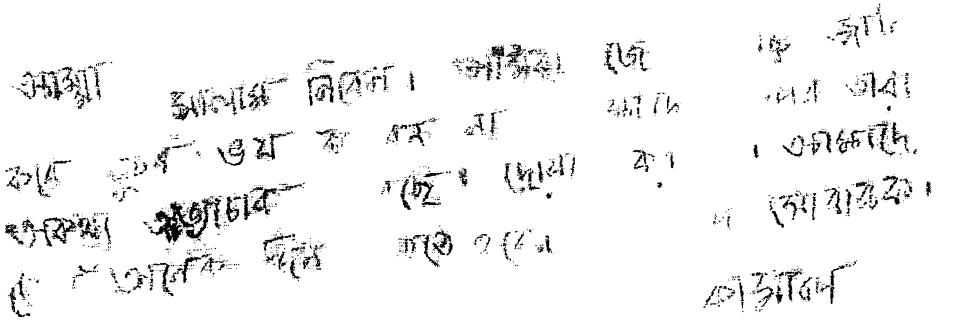

০১-১১-৭১

আম্মা,
সালাম নিবেন। আমরা জেলে আছি। জানি না কবে ছুটব। ভয় করবেন না। আমাদের ওপর তারা অকথ্য অত্যাচার করেছে। দোয়া করবেন। আমাদের জেলে অনেক দিন থাকতে হবে। ঈদ মোবারক।
কামাল

চিঠি লেখক : কামাল। পুরো নাম মোস্তফা আনোয়ার কামাল।

চিঠি প্রাপক : মা আনোয়ারা বেগম। স্বামী : মো. শির মিয়া। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলে কামাল এবং তাঁর পিতা ২১.১১.১৯৭১ তারিখে শহীদ হন।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : ডা. মুনিয়া ইসলাম চৌধুরী, ৩৬ চামেলীবাগ, শান্তিনগর, ঢাকা।

ত্রিপুরা, ভারত
০২/১১/৭১ ইং

শ্রদ্ধেয় আব্বা,

আস্‌সালামু আলাইকুম। আশা করি আল্লাহ তায়ালার অসীম রহমতে ভালো আছেন। আপনাদের দোয়ায় আমিও ভালো আছি। পর সমাচার এই যে, গত ৫ই জুন মুক্তিবাহিনীতে অংশগ্রহণের জন্য বাড়ি হতে ভারতের উদ্দেশে রওয়ানা হলে আলগী বাজারে এসে বড় ভাইয়ের কান্নাকাটির ফলে বাড়ি চলে যেতে হয়েছিল। কিন্তু দেশ ও বাঙালির এই চরম দুর্যোগ মুহূর্তে ও পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের জঘন্যতম অত্যাচার আমরা চোখ মেলে সহ্য করতে পারি না। আপনি তো জানেন শেখ মুজিবুর রহমান একজন মহান নেতা। সারা বাংলার জনগণ তাকে ভোট দিয়েছে, আপনিও তাকে বাংলার যোগ্য ও সাহসী নেতা হিসেবে ভোট দিয়েছেন। দেশের স্বার্থে তিনি যদি প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকেন, তবে তার ডাকে আমরা যদি পিছপা হয়ে যাই, তবে কোনো দিনই দেশের মুক্তি আসবে না। তাই দেশের স্বার্থে প্রতিটি যুবক-কিশোরকে মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং নিয়ে পাকিস্তানিদের মোকাবেলা করা দরকার মনে করে বাড়ি থেকে চলে এসেছি—। আব্বা, আপনাকে না জানিয়ে বাড়ি থেকে চলে এসেছি, সেই জন্য আমাকে মাফ করে দিবেন। ছোটবেলায় মাকে হারিয়েছি, আপনি একসাথে মা ও বাবার দায়িত্ব পালন করেছেন। নানা ধরনের আবদার ও অনেক দুষ্টুমিতে আপনি রাগান্বিত হয়েছেন, আবার স্নেহভরে মায়ের মতো কোলে তুলে নিয়েছেন। যদি দেশ স্বাধীন হয় তবে বীরদর্পে আপনার নিকট আবার ফিরে আসব। আর যদি কোনো যুদ্ধে শহীদ হই তবে আমাকে মাফ করে দিবেন। বড় ভাইকে বোঝাবেন, যাতে আমার জন্য কোনো চিন্তা না করে। হয়তো বা বোনেরাও ছোট ভাই হিসেবে অনেক কান্নাকাটি করে—তাদেরকেও সান্ত্বনা

দিবেন। আসার সময় মুতি ভাইকে বলে এসেছি। আমার কাছে ১৬ টাকা ছিল, মুতি ভাই আসার সময় আমাকে ২০ টাকা দিয়ে বলেছে, তুই যা আমিও আসছি। জানি না মুতি ভাই কোথায় আছে, কী করছে। ইন্ডিয়া এসে দেশের অনেকের সাথে দেখা হয়েছে। আমার গ্রামের আপ্তাব উদ্দিন ভুইয়া এমএলএ একটি ক্যাম্পের দায়িত্বে আছে। তার সাথে ১ সপ্তাহ ছিলাম। ২১ দিন অস্ত্র ট্রেনিং শেষ করার পর বর্তমানে তাড়াইল-এর এক ক্যাপ্টেন আ. মতিন সাহেবের ক্যাম্পে আছি। ক্যাম্পের নাম ই কোম্পানি, ৩ নং প্লাটুন, ৩ নং সেক্টর। ক্যাম্পটি আগরতলার কাছে মনতলায় অবস্থিত। বাড়ি থেকে আসার সময় ও ট্রেনিং সেন্টারে অনেক কষ্টই হয়েছে। বর্তমানে খাওয়াদাওয়া সবকিছুই ভালো। প্রতি মাসে কিছু বেতনও পাচ্ছি। প্রায়ই বর্ডারে ডিউটি করতে হয়। গত ২৮ তারিখে সিলেটের মনতলার কমলপুরে একটি অপারেশনে গিয়েছিলাম। পাকিস্তানিদের সাথে আমাদের জয় হয়েছে। আমাদের এখানে রায়পুরার ১৪ জন আছি। আমাদের গ্রামের জহির, আ. হাই ও আবদুল্লা আমার সাথে আছে। এলাকার অনেকেই ট্রেনিং শেষে বাড়ি চলে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের ক্যাপ্টেন সাহেব আমাদেরকে ছাড়ছেন না। তিনি বলেন, আমরা দেশ স্বাধীন করতে এসেছি। দেশ স্বাধীন করে আমরা একসাথে দেশে যাব। জানি না কবে দেশ স্বাধীন হবে, কবে দেশে আসতে পারব। সময় কম। ব্যারাক ডিউটির সময় হয়েছে। ডিউটিতে চলে যাব। পরে সুযোগ পেলে সব কিছু জানাব।

আমার জন্য সবাইকে দোয়া করতে বলবেন। আল্লাহ আপনাদের সকলের মঙ্গল করুক।

ইতি—

আপনার স্নেহের পুত্র—

নজরুল ইসলাম (নয়াব মিয়া)

চিঠি লিখেছেন : মুক্তিযোদ্ধা নজরুল ইসলাম (নয়াব মিয়া)।

চিঠি প্রাপক : বাবা আলাউদ্দিন আহমেদ (দুদু মিয়া)।

চিঠি পাঠিয়েছেন : লেখক নিজেই। বর্তমান ঠিকানা : গ্রাম ও ডাক : রামনগর (মতিনগর), উপজেলা : রায়পুরা, জেলা : নরসিংদী।

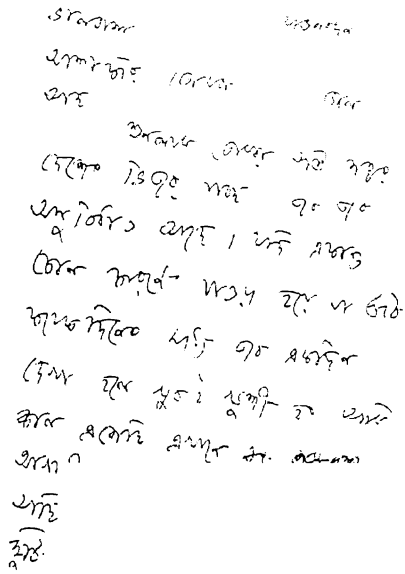

Agartala
10.11.71

স্নেহের মঞ্জুর,

আমার বিপ্লবী অভিনন্দন ও ভালোবাসা নিয়ো এবং সবাইকে দিয়ো। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছ।

শুনলাম তোমরা অতিসত্বর দেশের ভিতরে যাচ্ছ। তবে তার অসুবিধাও আছে। যদি একান্ত কোনো কারণে যাওয়া হয়ে না ওঠে কয়েক দিনের মধ্যে, তবে একদিন দেখা হলে খুবই খুশি হব। আমি কাল এসেছি এখানে এবং আগামী ২০ শে পর্যন্ত অবশ্যই এখানে আছি। তত দিন থাকলে একদিন ছুটি নিয়ে আসতে পারবে আশা করি।

আমি এখন মোটামুটি ভালোই আছি। তোমাদের তথা আমাদের সবারই সাফল্য কামনা করি। শুভেচ্ছা রইল।

ইতি
তোমাদের
আমিন ভাই

পুনঃ ভিতরে ঢোকার দিন তোমার ছোট ভাই-এর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। খুবই আনন্দ পেয়েছি।

চিঠি লেখক : আমিন। এটা তাঁর ছদ্মনাম। প্রকৃত নাম অনিল মুখার্জি। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা।

চিঠি প্রাপক : মনজুরুল আহসান খান। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : প্রাপক নিজেই

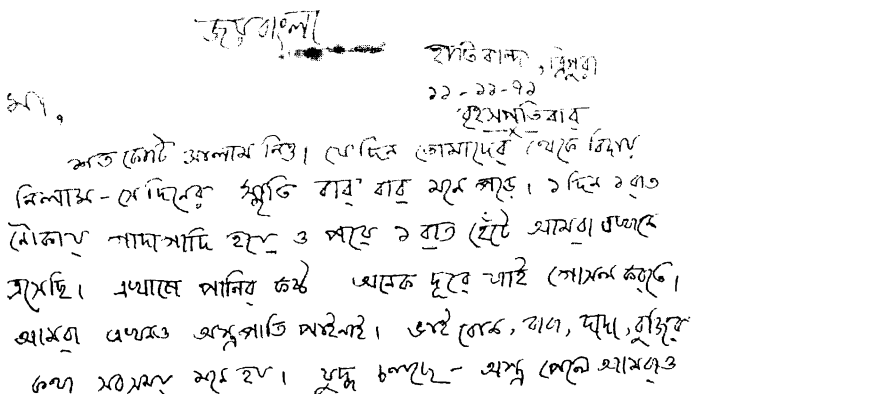

জয় বাংলা

হাতিবান্ধা, ত্রিপুরা
১১-১১-৭১
বৃহস্পতিবার

মা,

শতকোটি সালাম নিয়ো। যেদিন তোমাদের থেকে বিদায় নিলাম—সেদিনের স্মৃতি বারবার মনে পড়ে। ১ দিন ১ রাত নৌকায় গাদাগাদি হয়ে ও পরে ১ রাত হেঁটে আমরা এখানে এসেছি। এখানে পানির কষ্ট—অনেক দূরে যাই গোসল করতে। আমরা এখনও অস্ত্রপাতি পাই নাই। ভাইবোন, বাবা, দাদা, বুজির কথা সব সময় মনে হয়। যুদ্ধ চলছে—অস্ত্র পেলে আমরাও যুদ্ধে যাব—তুমি প্রাণভরে দোয়া করবে—দেশ স্বাধীন করে তোমাদের মাঝে ফিরব। লতিফ, মোফাজ্জল, ডালু আমার প্রতি খেয়াল রাখে। আমার জন্য চিন্তা করবে না। দেশ স্বাধীন করেই তোমার ছেলে তোমার বুকে ফিরবে। তুমি শুধু দোয়া করবে। কাশেম, জায়েদা, হাশেম, মাসু ও আবুর প্রতি খেয়াল রাখবে।

ইতি
তোমার আদরের
জয়নাল

চিঠি লেখক : মুক্তিযোদ্ধা জয়নাল। প্রকৃত নাম জয়নাল আবেদীন। পিতা : মরহুম ইউনুস মিয়া। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক।

চিঠি প্রাপক : তাঁর মা; পুরো নাম : সবর বানু। প্রযত্নে : বিন্দু ফকির, ফকিরবাড়ী, গ্রাম : বেজগাঁও, ডাক : শ্রীনগর, জেলা : ঢাকা। বর্তমান জেলা : মুন্সিগঞ্জ।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : পত্র লেখকের কন্যা বুশরা আবেদীন।

Abdul Quayum Mukul
Patan, Gangarampur
West Dinajpur

১৬/১১/১৯৭১
বাইখোরা, ত্রিপুরা
বেইস ক্যাম্প

প্রিয় মুকুল,

একটা বিরাট ট্র্যাজেডি ঘটে গেছে। যন্ত্রণায়, ক্লান্তিতে কাতর হয়ে আছি। আমাদের প্রিয় আজাদ শহীদ হয়েছে, সাতজন কমরেডের সাথে। অ্যামবুশে পড়ে, হানাদার বাহিনীর সঙ্গে সামনাসামনি যুদ্ধ করতে করতে তারা শহীদ হয়েছে। কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম থানার বেতিয়ারা গ্রামের কাছে এই যুদ্ধ হয়েছে। আমাদের গেরিলারা ফায়ার করতে করতে ব্যাক করে আসার চেষ্টা করে। ৪০ জনের মতো যোদ্ধা গেরিলা দলে ছিল। একজন সিভিলিয়ান গাইড আর আজাদসহ মোট ছয়জন গেরিলা যোদ্ধা—এই মোট সাতজন শহীদ হয়েছে। ১০-১২ জন কিছুটা বেশি আর অন্যরা সামান্য আহত হয়েছে। সকলের জন্য, বিশেষত আজাদের জন্য আমার মন কেমন করছে, তা অনুমান করতে পারছ নিশ্চয়ই। তোমার মনের অবস্থা এই খবর জেনে কেমন হবে, সেটাও আমি বুঝতে পারছি। আজাদ সম্পর্কে কত কথা তো মাত্র সাত দিন আগেই হয়েছিল কলকাতায়। ছয়-সাত মাস পরে তোমার সঙ্গে ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সভা উপলক্ষে কলকাতায় দেখা হলো। আমি অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করছি। রণাঙ্গন থেকে দুই দিনের জন্য কলকাতায়। ফিরে গিয়ে আজাদকে তোমার কোন কোন গল্প শোনাতে হবে, তা দুজনে মিলে ঠিক করেছিলাম। মনে আছে নিশ্চয়ই। আর আগরতলা ফিরেই রাত শেষে ভোরের সংবাদ—আজাদ এবং আরও কয়েকজন কমরেড আর নেই। বড় বিপর্যয় হয়ে গেছে। এসব ঘটনা ১১ নভেম্বরের।

অ্যামবুশের পরে আমাদের গেরিলারা ফিরে এসে সীমান্তের এপারে ইনডাকশন ক্যাম্পে রিগ্রুপ করেছে। আমি ১২ তারিখেই সেখানে চলে যাই। সব খবর বিস্তারিত শুনলাম। এই ব্যাচের কমান্ডার মনজুর ভাই আগেই সেখানে পৌঁছে গেছে। ইয়াফেজ, হেলাল—ওরা জীবিত ফিরতে পেরেছে। আমার মনটা আরও বেশি খারাপ এ জন্য যে, গেরিলা দলের ইনডাকশনের সবগুলো অপারেশন আমার তত্ত্বাবধানে হয়ে থাকে। কিন্তু

এবার মাত্র দুই দিনের জন্য কলকাতায় গিয়েছি, যাতায়াত মিলে মাত্র চার দিনের জন্য বেইস ক্যাম্পের বাইরে আছি। আমাকে বাদ দিয়েই ইনডাকশনের ব্যবস্থা করে ফেলল! সামনের কয়েকজনের হাতে loaded arms ছিল। অথচ পেছনে বেশির ভাগের arms-amunaition-ই প্যাক করা। আধা গেরিলা কায়দা আধা ফ্রন্টাল combat-এর কায়দা। সমস্যা হয়েছে তাতেই। তার পরেও যুদ্ধ করে, fire back করতে করতে প্রায় গোটা দলই সফলভাবে retreat করতে সক্ষম হয়েছে। পাক আর্মি সিঅ্যান্ডবি রোডে ভারী সমরযান নিয়ে এসে অ্যামবুশ করেছিল। হেভি মেশিনগান দিয়ে ফায়ার করে নির্বিচারে। এর মধ্যেও বেশির ভাগ জীবিত ফিরে আসতে পেরেছে।

গেরিলা কমরেডরা এক-দুই দিন বিমর্ষ ছিল। তৃতীয় দিনে খুবই high moral ফিরে এসেছে। মনজুর ভাই বক্তৃতা করেছে। খুব সাহায্য হয়েছে তাতে। আমি কথা বলছি। পাশে কমান্ডারদের পেয়ে ওদের মনোবল চাঙা হয়েছে। নতুন করে প্রস্তুতি নিচ্ছে। ড্রিল করা শুরু হয়েছে। এবার যেন বিপর্যয় না হয়।

একটা enquiry committee করা হয়েছে। আমি তার সদস্য। পরশু আবার যাব এলাকায়। ভৈরব টিলা নামের পোস্ট থেকে এলাকাটা দেখা যায়। দুজনকে ছদ্মবেশে দেশের ভেতরে, বেতিয়ারা ও আশপাশের গ্রামে সরেজমিনে খবর সংগ্রহের জন্য পাঠানো হয়েছে। আগামী পরশু তারা ফিরবে। ওরা খবরে জেনেছে যে, বেতিয়ারার পথের পাশে পাঁচ-ছয়জনকে কবর দেওয়া হয়েছে।

অনেক খবর লিখলাম। লিখে শান্তি পেলাম কিছুটা। চিঠিটা গোপন রাখবে।

আমি শিগগিরই ভেতরে যাব হয়তো। দেশ স্বাধীন হবেই। আমাদের সাধনা, জনতার জীবনপণ প্রচেষ্টা সফল হবেই। লাল সালাম।

ইতি

সেলিম

চিঠি প্রেরক : মুক্তিযোদ্ধা সেলিম, পুরো নাম মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম। ১৯৭১ সালে তিনি ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি ও ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীদের নিয়ে গঠিত বিশেষ গেরিলা বাহিনীর একজন কমান্ডার এবং অপারেশন প্লানিং কমিটির (OPC) সদস্য ছিলেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক।

চিঠি গ্রাপক : মুকুল, তাঁর পুরো নাম আব্দুল কাইয়ুম মুকুল। ১৯৭১ সালে ছাত্র ইউনিয়নের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ভারতের পশ্চিম দিনাজপুরের পাটনে ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি ও ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীদের জন্য যে ইয়ুথ ক্যাম্প স্থাপন করা হয়, সেই ক্যাম্পের দায়িত্বে ছিলেন। বর্তমানে তিনি *প্রথম আলোর* যুগ্ম সম্পাদক।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : আব্দুল কাইয়ুম।

১৭-১১-৭১

ছোট ভাই

স্নেহাশীষ নিয়ো। থানা সেল গঠন করে সত্বর নাম পাঠাতে হবে। মামাদের নেওয়ার ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নিইনি। জিনিসপত্র পাঠানো যাবে—কিন্তু সময় সাপেক্ষে। শীতের বস্ত্র কেনার জন্য জনপ্রতি ১০ টাকা করে পাঠালাম। জনসাধারণকে বুঝিয়ে অন্যান্য খরচের ব্যবস্থা করতে হবে। এটা তো তোমরা ভালো করেই বুঝতে পার। আপাতত ৫০ টাকা পাঠালাম। দলীয় বিশ্বাসঘাতকদের শাস্তির ব্যবস্থা করেছে কি না জানিয়ো। হযরত আলী, রহিম আমাদের কাছে আছে। পরে যাবে। বাহককে ৫০ টাকা দিলাম। ব্যবসাসংক্রান্ত ব্যাপারে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তার ২৪ দিনের পরবর্তী সাত দিনের কাজ আরম্ভ করবে এবং খবর জানাবে। নতুন সংকেত দিলাম। এগুলো ব্যবহার করেই চিঠি দিয়ো।

ইতি

বড় ভাই

সংগ্রহ : বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ : দলিলপত্র থেকে

১৭.১১.৭১

লেফটেন্যান্ট রফিক

(১) দুই-এক দিনের জন্য ভাঙ্গাবাড়ীর ৮৯ এমএম মর্টার দিয়ে কাজ চালাও; আর বাইরেটা সম্ভব হলে ওয়েল্ড করে নাও, না হয় এখানে পাঠিয়ে দাও। ভাঙ্গাবাড়ীর দিকে একজন এমএফসি ও কাইসাবাড়ীতে একজন এফএফসি রাখতে পার। জিরোআরজে-২০ (জাপানি সেট) সেটটা পাঠিয়ে দিয়ো আজকেই।

(২) ঐ দিনের প্লানিংটা এক দিনের (২৪ ঘণ্টা) জন্য পিছিয়ে গিয়েছে।

এম. জাহাঙ্গীর

৭ নং সেক্টরের ভোলাহাট সাবসেক্টরের কমান্ডার সেকেন্ড লে. (পরে মেজর) রফিকুল ইসলামকে যুদ্ধের নির্দেশ দিয়ে ১৭ নভেম্বর এই চিঠিটি লেখেন ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর। বিজয়ের মাত্র দুদিন আগে নবাবগঞ্জ থানা মুক্ত করতে গিয়ে শহীদ হন তিনি। চিঠিটি ২৬ মার্চ ২০০৫ তারিখে *প্রথম আলো*তে প্রকাশিত হয়েছিল।
সংগ্রহ : মেজর (অব.) রফিকুল ইসলাম পিএসসি-র কাছ থেকে।

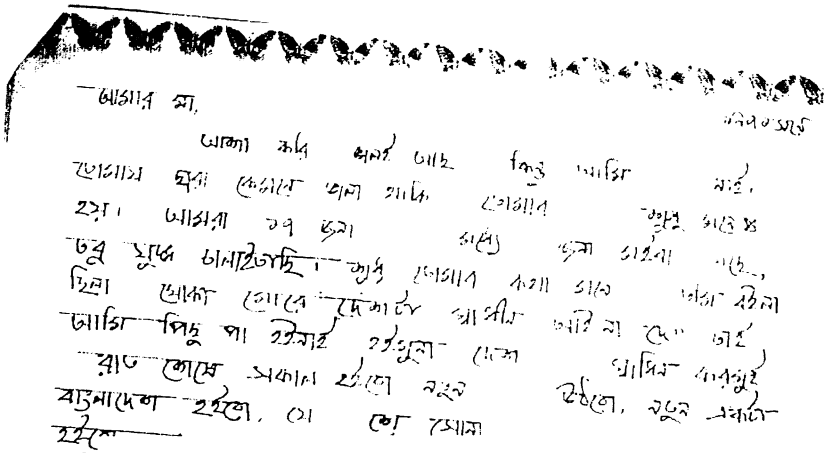

১৯ই নভেম্বর ১৯৭১ সন

আমার মা,

আশা করি ভালোই আছ। কিন্তু আমি ভালো নাই। তোমায় ছাড়া কেমনে ভালো থাকি। তোমার কথা শুধু মনে হয়। আমরা ১৭ জন। তার মধ্যে ৬ জন মারা গেছে, তবু যুদ্ধ চালাচ্ছি। শুধু তোমার কথা মনে হয়, তুমি বলেছিলে 'খোকা মোরে দেশটা স্বাধীন আইনা দে'; তাই আমি পিছু পা হই নাই, হবো না, দেশটাকে স্বাধীন করবই। 'রাত শেষে সকাল হইবো, নতুন সূর্য উঠবো, নতুন একটা বাংলাদেশ হইবো, যে দেশে সোনা ফলায়' রক্তপাত বন্ধ হবে, নতুন রাত আসবে, মোরা শান্তিতে ঘুমাবো। আর যদি তার আগে আমি মরে যাই তবে তুমি দেখবে, গোটা দেশ দেখবে। একটু আগে একটা যুদ্ধ শেষ করে এলাম। এখন আবার যাবো, বাবা ভালো থেকো। নয়ন ভাই আমার বাংলার পতাকা হাতে নিয়ে উড়াবে। বোন ময়না, মা বাবারে ভাল করে দেখো। আর বেশি দেরি নাই আমাদের দেশ আবার স্বাধীন হবে। আমি বাড়ি ফিরে যাব। যাওয়ার দিন বাবার পাঞ্জাবি, মার শাড়ি, ময়নার চুড়ি, নয়নের পতাকা আনবো। শুধু আমার জন্য দোয়া করো না, সবার জন্য দোয়া করো, যাতে দেশটা স্বাধীন হয়। আর বেশি কিছু নয়। এখনি একটা যুদ্ধে যাবো। আমার লেখা ভাল নয়, তবু ময়নার দ্বারা শুনো। আল্লাহ হাফেজ।

ইতি—

যুদ্ধখানা হইতে তোমার পোলা (ছেলে)

নূরুল হক

জয় বাংলা

হাতিবান্দা, ত্রিপুরা

চিঠি লেখক : মুক্তিযোদ্ধা নূরুল হক।

প্রাপক : মা। মেহের আফজান নেসা।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : মো : হানিফ তাহসীন প্রধান, গ্রাম : ছোট মির্জাপুর, মধ্যপাড়া, বড়দরগাহ, ডাক : গুড্ডিপাড়া, থানা ও উপজেলা : পীরগঞ্জ, জেলা : রংপুর।

জয় বাংলা

করিমগঞ্জ, আসাম
২৩-১১-১৯৭১

জনাব শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, এমপিএ
মুজিবনগর, কলিকাতা, ইন্ডিয়া

প্রিয় নেতা,

সংগ্রামী অভিনন্দন। আশা করি ভালো আছেন। সেই যে এপ্রিল মাসে আমাদের রেখে চলে এলেন—আর কোনো খবর পেলাম না। তবে স্বাধীন বাংলা বেতারের খবরে আমরা আপনার খবর পেয়েছি। শ্রীনগরে আর্মি আসার পূর্বে থানার অস্ত্র ফেরত দেওয়ার জন্য বাবার ওপর অনেক চাপ এসেছে। মালেক ভাইয়ের বাবাকেও মীরসাহেব ডেকে এনে অস্ত্র ফেরত দিতে বলেছে। আমরা মুক্তিবাহিনীতে বহু কষ্ট করে আসতে পেরেছি। আপনি জানেন আমরা অনেকেই জীবনে মুনশীগঞ্জ ও ঢাকা ছাড়া আর কোথাও যাইনি। তাই বর্ডার পার হয়ে ইন্ডিয়া আসা আমাদের জন্য খুব কঠিন ছিল। দেউলভোগের খালেক ভাই অনেককে ইন্ডিয়ার বর্ডার পার করে দিয়েছে—কিন্তু আমাদের তার সঙ্গে আসতে দেয় নাই। মজনু ভাই বলেছে, খালেক কমিউনিস্ট—তার সাথে নাকি ছাত্রলীগের ছেলেদের যেতে নেই। খালেক ভাইয়ের সঙ্গে এলে এত দিনে আমরা অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করতে পারতাম।

লেবু কাজী ভাই কলকাতা থেকে ফিরলে আমাদের অস্ত্র পাওয়ার একটা গতি হবে। আমাদের ট্রেনিং ভালোই হয়েছে। লেবু ভাইয়ের সাথে আপনি পত্র দিয়ে কুদ্দুস মাখন ভাই ও মনি ভাইকে বলে দিলে আমরা তাড়াতাড়ি অস্ত্রসহ দেশের ভিতর যেতে পারব।

দেশ কবে স্বাধীন হবে—জানি না। আমাদের আর দেখা হবে কি না আল্লাই জানেন। বঙ্গবন্ধুর খবর কী? তাঁকে কি ওরা ছাড়বে? দোয়া করি তিনি বেঁচে থাকুন। ভাবি ও রানা কেমন আছে? আমাদের জন্য দোয়া করবেন। বেঁচে থাকলে দেখা হবে।

ইতি

জয়নাল আবেদীন
সভাপতি, থানা ছাত্রলীগ, শ্রীনগর, বিক্রমপুর

চিঠি লেখক : মুক্তিযোদ্ধা জয়নাল আবেদীন। পিতা : মরহুম ইউনুস মিয়া। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক।
চিঠি প্রাপক : শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন।
চিঠিটি পাঠিয়েছেন : পত্র লেখকের কন্যা বুশরা আবেদীন।

২৮.১১.৭১

নবী,

১. আমি আহত, তাই আমাকে সরিয়ে আনা হয়েছে। ২. সৈন্যদের মনোবল বাড়াবে। তারা খুব ভালো করছে। আমরা প্রমাণ করেছি যে, আমরা হামলা করতে জানি এবং লক্ষ্যবস্তু দখল করে নিতে পারি। ৩. সৈন্যদের অবস্থানের পুনর্বিন্যাস করবে এবং ছোটখেলের চারদিকেই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলবে। ৪. প্রতিরক্ষাব্যবস্থা হবে চারদিকে ঘিরে এবং নিশ্ছিদ্রভাবে। আজ দুপুরের মধ্যেই নিশ্চিতভাবে শত্রুর হামলা প্রতিহত করার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকবে। ৫. আলী আকবরের প্লাটুনের অবস্থান এবং তার চারটি সেকশনই ঢেলে সাজিয়ে নেবে। ওই অবস্থানটির পুনর্বিন্যাস করে নেবে। ৬. আরও গোলাবারুদ সংগ্রহের ব্যবস্থা করবে। ৭. তুমি এখন থেকে ডাউকি সেক্টরে অবস্থানরত তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সব ইউনিট এবং বাহিনীর কমান্ডার। ৮. আমার আহত হওয়ার সংবাদ সৈনিকদের দেবে না, তাদের সাহস দেবে এবং আমার ধন্যবাদ জানাবে।

মেজর শাফায়াত

---

২৮ নভেম্বর ছোটখেল অপারেশনে গুলিবিদ্ধ হয়ে জেড ফোর্সের তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার মেজর (পরে কর্নেল) শাফায়াত জামিল গুরুতর আহত হলে সহযোদ্ধারা তাঁকে লুনি গ্রামে নিয়ে যান। সেখানে ডা. ওয়াহেদের কাছ থেকে কাগজ-কলম নিয়ে তিনি ডেল্টা কোম্পানির অধিনায়ক লে. (পরে লে. কর্নেল) নবীকে তাঁর অনুপস্থিতিতে তৃতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়কের দায়িত্ব অর্পণসহ জরুরি করণীয় কাজগুলোর নির্দেশ দিয়ে এ পত্রটি লেখেন। চিঠিটি লেখা ছিল ইংরেজিতে। এই চিঠিটি ২৬ মার্চ ২০০৫ তারিখে *প্রথম আলো*তে প্রকাশিত হয়েছিল।
সংগ্রহ : লে. কর্নেল (অব.) নুরুন্নবী খান বীর বিক্রমের কাছ থেকে।

২৯/১১/৭১

শ্রদ্ধাবরেষু,

ভাই, সালাম জেনো। কুচবিহার থেকে একটা চিঠি দিয়েছি গত সপ্তাহে বা তার কিছু আগে। পেলে কি না জানাবে। তোমার বা আমার চিঠি প্রায়শই হারাচ্ছে। কিছুদিন আগে কুচবিহার থেকে ফিরলাম। শত্রুদের কাছ থেকে সদ্য দখল করে নেওয়া বিস্তীর্ণ অঞ্চল দেখে এলাম। দশটা থানা আমাদের দখলে। অসম্ভব সুন্দর ডিফেন্স। জীবনযাত্রা বেশ নরমাল। ভারতীয় সৈন্য দ্বিতীয় ডিফেন্সে আছে—চিন্তার বিশেষ কিছু নেই বলে আমাদের বিশ্বাস। আমাদের সৈন্য বা মিলিটারি অফিসাররা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রাখতে যথেষ্ট সমর্থ। ডিসকারেজ হয়ো না। পাকিস্তানে ফিরবার সামান্যতম বাসনাও বাদ দাও। ঢাকার অবস্থা আবার দিন দিন খারাপ হতে চলেছে। খবরও বিশেষ পাওয়া যাচ্ছে না। চিঠিপত্র লিখো মাঝে মাঝে।

কুচবিহারে বড় ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে। কয়েক দিন গেছলাম ভাইয়ের ক্যাম্পে। ওখানে সেক্টর অফিসে আছেন। কাজ করছেন—ফ্রন্টে যেতে হয় না। কাজেই তাঁকেও কাজেই থাকতে আমি বলেছি। চিনু একেবারে ফ্রন্টে আছে—শহর থেকে ৬/৭ মাইল দূরে তাদের বেস্। ওর এক কমরেডের সঙ্গে দেখা হয়েছে—ওরা ভালো আছে—গ্রামাঞ্চলে ওরা দেবতার মতো পূজ্য বলে শুনছি।

আমি আগামীকাল আবার কুচবিহার যাচ্ছি—কলকাতায় থাকছি না, আর কাজ ওদিকেই হবে বোধ হয়। চিঠি কুচবিহারে দিও। ঠিকানা, প্রযত্নে : তাইবুর রহমান, ইনচার্জ, বাংলাদেশ যুব শিবির, সুভাষ পল্লী, কুচবিহার, উত্তরবঙ্গ, ভারত।

মুশতাক ইলাহী

চিঠি লেখক : মুক্তিযোদ্ধা কে মুশতাক ইলাহী। তাঁর পিতার নাম : খোন্দকার দাদ ইলাহী, ঠিকানা : ধাপ, মেডিকেল মোড়, রংপুর।

চিঠি প্রাপক : ভাই, কে. মউদুদ ইলাহী।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : ড. কে মউদুদ ইলাহী, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, ঢাকা। তিনি মুক্তিযোদ্ধা কে মুশতাক ইলাহীর ভাই।

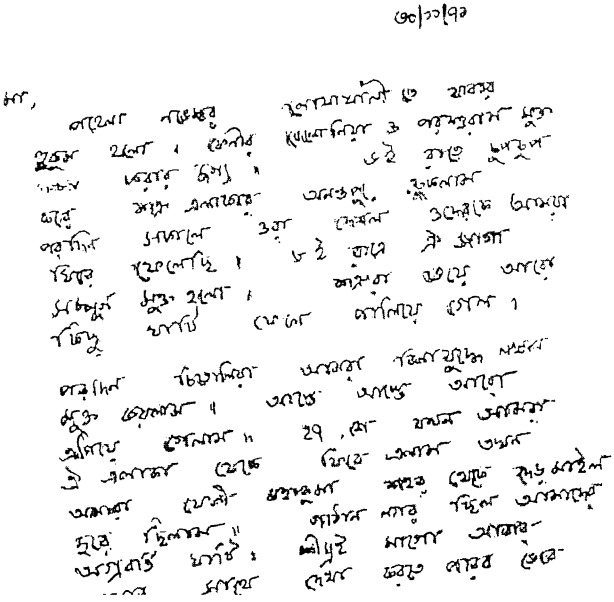

৩০/১১/৭১

মা,

পহেলা নভেম্বর নোয়াখালীতে যাওয়ার হুকুম হলো। ফেনীর বেলোনিয়া ও পরশুরাম মুক্ত করার জন্য। ৬ই রাতে চুপ চুপ করে শত্রু এলাকার অনন্তপুরে ঢুকলাম। পরদিন সকালে ওরা দেখল ওদের আমরা ঘিরে ফেলেছি। ৮ই রাতে ওই জায়গা সম্পূর্ণ মুক্ত হলো। শত্রুরা ভয়ে আরও কিছু ঘাঁটি ফেলে পালিয়ে গেল।

পরদিন চিতোলিয়া আমরা বিনাযুদ্ধে মুক্ত করলাম। আস্তে আস্তে আরও এগিয়ে গেলাম। ২৭ শে নভেম্বরে যখন আমরা ওই এলাকা থেকে ফিরে এলাম, তখন আমরা ফেনী মহকুমা শহর থেকে দেড় মাইল দূরে ছিলাম। পাঠাননগর ছিল আমাদের অগ্রবর্তী ঘাঁটি। শিগগিরই মাগো, আবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারব ভেবে মনটা আনন্দে ভরে গেল।

জানো মা, এই যুদ্ধে আমরা ৬০ জন শত্রু ধরেছি। আমাদের কোম্পানির তিনজন শহীদ ও একজনের পা মাইনে উড়ে গেছে।

দোয়া করো, মা।

সেলিম

চিঠি লেখক : শহীদ লে. সেলিম। তাঁর পুরো নাম সেলিম মোঃ কামরুল হাসান। স্বাধীনতার পর ৩০ জানুয়ারি ১৯৭২ মিরপুর শত্রুমুক্ত করতে গিয়ে তিনি শহীদ হন।

চিঠি প্রাপক : মা। সালেমা বেগম।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : শহীদ সেলিমের ভাই ডা. এম এ হাসান, আল বিরুনী হাসপাতাল, দারুস সালাম, মিরপুর, ঢাকা।

বাংলাদেশ, ৩ ডিসেম্বর ১৯৭১

মা,

তুমি আজ কোথায় জানি না। তোমার মতো শত শত মায়ের চোখের জল মুছে ফেলার জন্য বাংলার বুকে জন্ম নিয়েছে লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা। আমি যদি মরে যাই তুমি দুঃখ কোরো না, মা। তোমার জন্য আমার যোদ্ধাজীবনের ডায়েরি রেখে গেলাম আর রেখে গেলাম লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা। তারা সবাই তোমার ছেলে। আজ হাসপাতালে শুয়ে তোমার স্নেহমাখা মুখখানি বারবার মনে পড়ছে। আমার ডায়েরিটা তোমার হাতে গেলে তোমার সকল দুঃখ দূর হয়ে যাবে। দেখবে, তোমার ছেলে শত্রুকে পেছনে রেখে কোনো দিন পালায়নি। যেদিন তুমি আমাকে বিদায় দিয়েছিলে আর বলেছিলে, শত্রু দেখে কোনো দিন পেছনে আসিসনে, বাবা। তুমি বিশ্বাস করো মা, শত্রু দেখে আমি কোনো দিন পালাইনি। শত্রুর বুলেট যেদিন আমার বুকের বাঁ দিকে বিঁধল সেদিনও তোমার কথা স্মরণে রেখেছিলাম। মা, আমার সবচেয়ে আনন্দ কোথায় জানো? আজ থেকে চার দিন পূর্বে একটি গ্রামের পাশ দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ বেদনাক্লিষ্ট একটি নারীকণ্ঠ ভেসে এল। কালবিলম্ব না করে সেদিকে দৌড়ে গেলাম। একটা গুলি আমার মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল—আবার একটা। এবার বুঝলাম শত্রুরা আমাকে লক্ষ্য করেই গুলি ছুড়ছে। তবুও আমি এগিয়ে চলছি। বাড়িটার পেছনে একটা বাঁশঝাড়ের আড়ালে পজিশন নিলাম। দেখলাম বিবস্ত্র একটি নারীর দেহ নিয়ে কয়েকজন পৈশাচিক খেলায় মেতে উঠেছে। আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না, মা। মনে পড়ে গেল বাংলার লক্ষ লক্ষ মায়ের কথা। শত্রুকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লাম। ওরাও অনবরত গুলিবর্ষণ শুরু করল। জ্ঞান ফিরে দেখি আমি হাসপাতালে। জানতে পারলাম আমার গুলিতে পাঁচজন নরখাদক পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। দোয়া করো, মা। ভালো হয়ে আবার যেন তোমার শত শত সন্তানের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মায়ের অপমানের প্রতিশোধ নিতে পারি।

ইতি

তোমার ছেলে

সংগ্রহ : বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র থেকে।

কোচবিহার
৮/১২/৭১

জনাবেষু,

আমার সালাম গ্রহণ করবেন এবং বাড়ির সবাইকে শ্রেণীমতো আমার সালাম এবং স্নেহাশিস জানাবেন। আপনার চিঠি পেয়ে আমি শিলচর থেকে চলে এসেছি। ২/৪ দিনের মধ্যে শেরপুর যাওয়ার উদ্দেশ্যে মেঘালয়ের দিকে পা বাড়াব। বর্ডার এলাকায় যারা ছিল তারা মনে হয় ঢুকে পড়েছে। সত্যি আমরা একটু পিছে পড়ে গেলাম না? আপনি কবে পর্যন্ত রওনা হবেন, চিচিং পাড়ার ঠিকানায় জানাবেন। যদি ভেতরে ঢুকে না পড়ি তাহলে হয়তো জানতে পারব।

শিলচর থেকে আসার পর আমি শারীরিক দিক থেকে ভালো আছি। কিন্তু মানসিক অবস্থাটা বেশি ভালো না। বিশেষ করে শেরপুরের নানা রকম খবর শোনার পর মনটা বিশেষ ভালো না। আপনাদের কুশল কামনা করে আজকের মতো শেষ করছি।

জয় বাংলা।

মোহন

চিঠি লেখক : মুক্তিযোদ্ধা মোহন। তিনি বর্তমানে শেরপুর জেলা বাস মালিক সমিতির সভাপতি।

চিঠি প্রাপক : অ্যাডভোকেট এম এ সামাদ। তিনি ২০০৭ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : ছেলে জয়েনউদ্দিন মাহমুদ।

৯.১২.৭১
পাঁচগাছিয়া, ফেনী

শ্রদ্ধেয় মা,

বাংলার রক্তরাঙ্গা উদয়াকাশে উদীয়মান সূর্যের তলে... বাংলার এহেন অবস্থায় স্বাধীনতা লাভের উৎসস্বরূপ প্রথম স্বাগত জানাই আপনাকে। মা, আমার অন্তরের অন্তর গুহা থেকে বারবার ঢেউ খেলে। বাংলার মুক্ত আকাশে আনন্দে তাল রেখে সবার মুখে মুখে স্বাধীনতার ছোঁয়াছ লাগিয়ে সবাইকে মুগ্ধ করে দিচ্ছে। আর জানাই পরম পূজনীয় শ্রদ্ধেয় 'বাবা'কে যার কথা মনে পড়ে প্রতি মুহূর্তে। যখন রাইফেলের ট্রিগার-এর ওপর আমার হাতের চাপ পড়ে, গর্জন করে ওঠে আমার বাংলার দুলাল শেখ মুজিবের সিংহ গর্জন কণ্ঠের ন্যায়।

মা, বহু বাধা-বিঘ্ন, বহু বুলেটের ফাঁকে বাংলা মায়ের আশীর্বাদে আজ আমরা ফেনীতে উপস্থিত হয়েছি। সেখানে বাংলাদেশের পতাকা পত্ পত্ করে উড়ে আনন্দে তাঁর আদরের সন্তানকে স্বাগত জানাচ্ছে।

কেমন করে দিন কাটাচ্ছেন জানি না। হয়তো বা ভয়ে নিরাশায় মলিন বেশে অন্তরের অন্তস্থল থেকে ভেসে আসছে এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস যার মধ্যে নিবিষ্ট এক মহা-আশীর্বাদ, শুধু আমার জন্য নয়, যত সব আপনার মতো দুঃখিনী মায়ের সন্তানেরা মাতৃভূমির ইজ্জত রক্ষার্থে, লাখো মা-বোনের ইজ্জত রক্ষার্থে বুলেটের সামনে নিজেকে আত্মোৎসর্গিত করেছে। মা, চিন্তার কোনো কারণ নেই, আশা করি কয়েক দিনের মধ্যে দেখা পাব।

মা, যখন শত্রুর 'ডিফেন্স' পেছনে ফেলে এগিয়ে আসছি, মনে বড় সংকোচ ছিল—জানি না লোকে আমাদের কীভাবে গ্রহণ করবে। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর লোকের আনন্দ-ফুর্তি দেখে সব ভয়, সংকোচ, কালিমা মন থেকে নিমিষে মুছে গেল। কেবল তারা পারছে না আমাদের তাদের পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে—এমন আনন্দ-উল্লাসে মত্ত তারা। আর কী লিখব! 'রক্ত ছালাম' দিয়ে সবার থেকে বিদায় নিচ্ছি।

ইতি
আপনার
তফিক

চিঠি লেখক : মুক্তিযোদ্ধা তফিক। পুরো নাম তৌফিকুল ইসলাম। বর্তমানে পূবালী ব্যাংক লিমিটেড, মেহেদীবাগ শাখা, চট্টগ্রামে ব্যবস্থাপক হিসেবে কর্মরত। তাঁর স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : দক্ষিণ হাইতকান্দি, থানা-মিরসরাই, জেলা : চট্টগ্রাম। যুদ্ধকালে তিনি নিজামপুর কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিলেন। মে, একাত্তরের মাঝামাঝি তিনি ভারতের হরিণা ইয়ুথ ক্যাম্পে যোগ দেন। আগস্টের শেষ দিকে আসামের লায়লাপুর ক্যান্টনমেন্টে এক মাসের ট্রেনিং শেষে নভেম্বরের ৭ তারিখে ১ নম্বর সেক্টরের অধীন ১ নম্বর সাব-সেক্টরে (বিলুনিয়া) সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নেন।

চিঠি প্রাপক : মা।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : লেখক নিজেই।

লক্ষ্ণৌ
১৩.১২.৭১ ইং

ভাবি,

আশা করি আপনারা নিরাপদে তুরা পৌঁছেছেন। আমরা আজ সকালে এখানে এসে পৌঁছি। রাস্তায় কোনো অসুবিধে হয়নি। ভাইজান বেশ ভালোই ছিলেন। গৌহাটি থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত ভ্রমণটা ছিল বড়ই মনোরম। সারি সারি পাহাড় আর তার পাদদেশে চায়ের বাগান। ভাইজান শুধু আপনার কথাই বলছিলেন, বলছিলেন কেন আপনাকে নিয়ে এলাম না। আপনি থাকলে ভ্রমণটা আরও আনন্দের হতো। ট্রেনে আমরা তিন রাত কাটাই। ভাইজানের বেশ ভালো ঘুম হয়। ব্যথাটাও ছিল খুবই কম। এই হসপিটাল শহর থেকে মাইল তিনেক দূর। ভাইজানের বেশ ভালো যত্ন নেওয়া হচ্ছে। আজ তার ড্রেসিং হয়, কয়েক দিনের মধ্যে Skin grafting করা হবে। এরপর ঘা-টা শুকিয়ে যাবে বেশ তাড়াতাড়ি। অনুমান করছি গোটা পনের দিনের মধ্যেই তাকে পুনা পাঠানো হবে। আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। তিনি এখন বেশ ভালো। পাশ ফিরেও শুতে পারেন।

AMC OFFICER'S MESS-এ আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। আমি থাকার জন্য একটা প্রকোষ্ঠ পেয়েছি। এখানকার খাবার গৌহাটি থেকে বেশ ভালো।

এখানে দুটো হসপিটাল আছে। কমান্ড হসপিটাল আর Base হসপিটাল। আমরা আছি Base হসপিটালে। কর্নেল খালেদ মোশাররফ রয়েছেন কমান্ড হসপিটালে। তিনি ভালো হয়ে গেছেন।

এইমাত্র সিস্টার এসে ভাইজানকে কয়েকটা পায়ের ব্যায়াম শিখিয়ে দিয়ে গেল। এখন ভাইজান অনেক কিছুই নিজেই করতে পারেন।

ট্রেনে বসে ভাইজান আপনার কাছে লিখেছেন। যে ঠিকানা দিয়েছেন সেটাতে লিখবেন না। আমি ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি।

অ্যাডমিনিসট্রেটিভ অফিসার মোহাম্মদ আলী সাহেবের কাছে ভাইজান চিঠি লিখেছেন, যেন দেশে যাওয়ার জন্য তিনি আপনাদের টয়োটা জিপটা দেন। আপনি এ ব্যাপারে তার সাথে যোগাযোগ করবেন। এর মধ্যেই হয়তো ময়মনসিংহ মুক্ত হয়েছে। কী আনন্দের মধ্যেই না আপনারা দেশে ফিরছেন। প্রত্যেক দিন ভাইজানের কাছে চিঠি লিখবেন, তাতে তিনি আনন্দে থাকবেন।

ঢাকা ফেরার আগে আমরা আপনাদের টেলিগ্রাম করব। আপনারা সদলবলে ঢাকাতে ভাইজানকে অভ্যর্থনা জানাবেন। দাদাভাইকে বলবেন, শ্যামগঞ্জ অথবা গৌরীপুর থেকে যেন বাড়িতে গাড়ি করে যেতে পারেন তার ব্যবস্থা করে। তাকে আরও বলবেন যেন আমার বন্ধু-বান্ধবদের খোঁজ করে। তারা যেন বিমানবন্দরে উপস্থিত থাকে।

নিতু কেমন আছে। ভাইজান প্রায় সময়ই আপনাদের কথা বলেন। আশা করি ভাবি আর জামি ভালো আছে।

আব্বা-আম্মা কেমন আছেন? তাঁদের সালাম বলবেন।

ডলি, জলি, ছবির কেমন আছে জানাবেন।

ভাবী, আপনি শরীরের প্রতি যত্ন নেবেন। কোনো চিন্তা করবেন না। ঢাকায় ফিরে ভাইজান যেন আপনাকে সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় পান।

স্নেহের

আনোয়ার

চিঠি লেখক : মুক্তিযোদ্ধা ড. আনোয়ার হোসেন। তিনি বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন।

চিঠি প্রাপক : লুৎফা তাহের। কর্নেল তাহেরের স্ত্রী।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : লুৎফা তাহের।

এই চিঠিটি লেখা হয় মুক্তিযুদ্ধের শেষদিকে, যখন কর্নেল তাহের আহত হয়ে, গৌহাটি সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসা শেষে আরও উন্নত চিকিৎসার জন্য লক্ষ্ণৌ সামরিক হাসপাতালে ছিলেন।

১৪.১২.৭১

শ্রদ্ধেয় মা

সর্বপ্রথম আমার সালাম গ্রহণ করিবেন। পর সমাচার এই যে, আজ প্রায় ছয় মাস গত হইয়া যায়, আমি আপনাদের কাছ হইতে বহু দূরে। আমি যতই দূরে থাকি না কেন আমার মনটা আপনাদের কাছে সর্বদাই থাকে। India হইতে বাহির হইয়া আসিলাম প্রায় এক মাস। ইহার মধ্যে প্রথম আমরা সিংগারবিল ও আখাউড়া এই সব এলাকায় আক্রমণ চালানোর পর শত্রুদের সাথে প্রায় তিন দিন যুদ্ধ হয়। এই তিন দিনের মধ্যে আমাদের ওপর বেশ হামলা চলিয়া গিয়াছে। বিশেষ করিয়া আমার আর এফ এফ লোকের ওপর বেশ চাপ চলিয়া গিয়াছে। যেদিন হানাদার পাকসেনারা আমাদের সাথে টিকিতে না পারে তখন আমাদের মরিচার (বাংকার) ওপর বৃষ্টির ফোঁটার মতো আর্টিলারি শেল মারিতে আরম্ভ করিল। ইহার মধ্যে তিনটি শেল আমার মরিচার চার কি পাঁচ হাত পূর্বে বা উত্তরে পড়িয়াছিল। শেলের দাপটে আমার এলএমজির (...) মাটিতে পুঁতিয়া গিয়াছিল। কিন্তু আল্লাহ ও আপনাদের দোয়ায় এখনো জীবিত আছি। তারপর সে জায়গা (...) জয় করিয়া সিলেট, কুমিল্লা আরও বহু জায়গা দখল করিয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া হইয়া ভৈরব দিক দিয়া ঢাকার দিকে অগ্রসর হই। তারপর রায়পুরা, নরসিংদী দিয়া এই মুড়াপাড়া পৌঁছিলাম।

এই চার-পাঁচ মাসের মধ্যে দেশের এই একটি লোকও দেখিতে পাই নাই। হঠাৎ আল্লাহর রহমতে মোড়াপাড়া আমরা ডিফেন্স নিয়াছি এমন সময় (...) সোনালীর বড় ভাইয়ের সহিত দেখা হইল। তখন মনটা যেন আনন্দে ভরিয়া উঠিল। তারপর উনার সাথে দেশের খবরাদি সম্বন্ধে আলাপ করিলাম। বিশেষ কিছু আর লিখিতে চাই না। অন্য সব উনার কাছ থেকে

জানিতে পারিবেন, আমি কী অবস্থায় আছি। আর অন্য বিশেষ চিন্তা করিবেন না। আল্লার রহমতে এই পর্যন্ত ভালোই আছি। সামসুল ইসলাম জেঠা শুনিয়াছিলাম ঢাকা চলিয়া আসিয়াছিল। শুনিয়া বড়ই চিন্তিত ছিলাম। এখন শুনিলাম বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।

উনার কাছে আমার সালাম জানাইবেন। সকল বড় মাকে আমার সালাম জানাইবেন ও আল্লাহর কাছে যেন দোয়া করে বাঁচিয়া থাকিয়া যেন তাহাদের দেখিতে পারি। ফাতেমা বুবুকে সালাম জানাইবেন। আর বিশেষ কিছু লিখিয়া বিরক্ত করিতে চাই না। বাড়ির সকলের প্রতি আমার সালাম রহিল।

ইতি
আপনার হতভাগা ছেলে
মো. মোস্তফা
2nd East Bengal
B. Coy
4-PL

চিঠি লেখক : মুক্তিযোদ্ধা ন. ম. মোস্তফা। তাঁর বর্তমান ঠিকানা : চর আহমদপুর, মনোহরদী, নরসিংদী।

চিঠি প্রাপক : মা জোবেদা খাতুন।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : পত্রলেখক নিজেই।

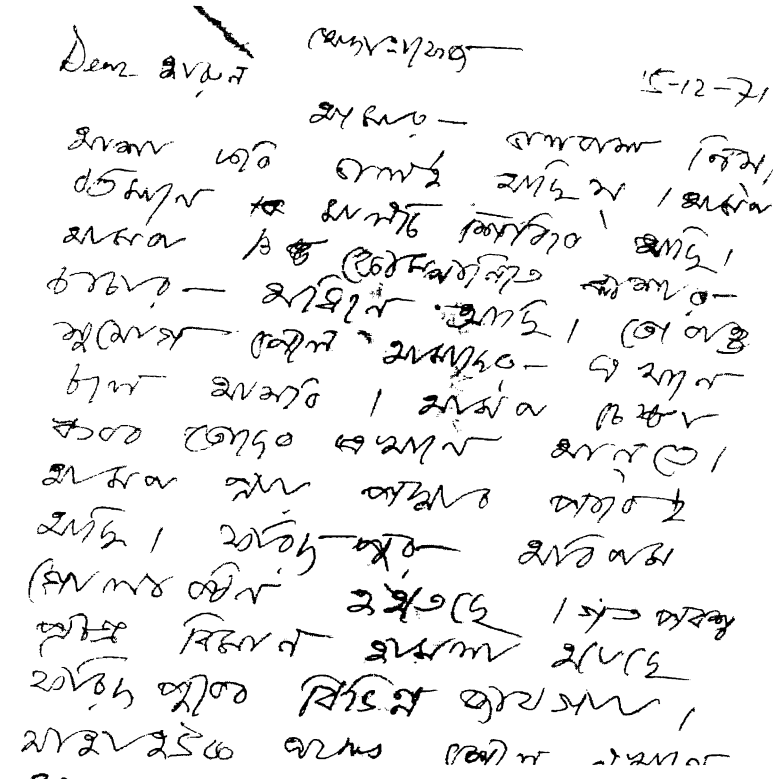

১৫-১২-৭১

খোদা হাফেজ

Dear হারুন

আমার ভালোবাসা নিস্। আশা করি ভালোই আছিস্। আমরা বর্তমানে মালচি শিবিরে আছি। আমরা β কোম্পানিতে বাশার চাচার অধীনে আছি। তোরাও সুযোগ পেলে আমাদের এখানে চলে আসবি। আমরা চেষ্টা করব তোদের এখানে আন্‌তে। আমরা প্রায় পদ্মার পারেই আছি। ফরিদপুরে অবিরাম গোলাবর্ষণ হচ্ছে। গত পরশু প্রচণ্ড বিমান হামলা হয়েছে ফরিদপুরের বিভিন্ন জায়গায়। যা হোক, Arms পেলে এখানে আস্‌তে চেষ্টা করবি। রফিক ও অন্যান্যদের আমার ভালোবাসা দিবি। আমরা এখানে ভালো।

ইতি

রেজু

চিঠি লেখক : মুক্তিযোদ্ধা রেজু। মানিকগঞ্জের মালচি মুক্তিযোদ্ধা শিবির থেকে তিনি চিঠিটি লিখেছিলেন।

চিঠি প্রাপক : মুক্তিযোদ্ধা মো. হারুনূর রশীদ। তাঁর পিতার নাম : মানিক মিয়া, ঠিকানা : গ্রাম : সোনাতলা; পো : শিকারীপাড়া, উপজেলা : নবাবগঞ্জ, জেলা : ঢাকা

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : প্রাপক নিজেই

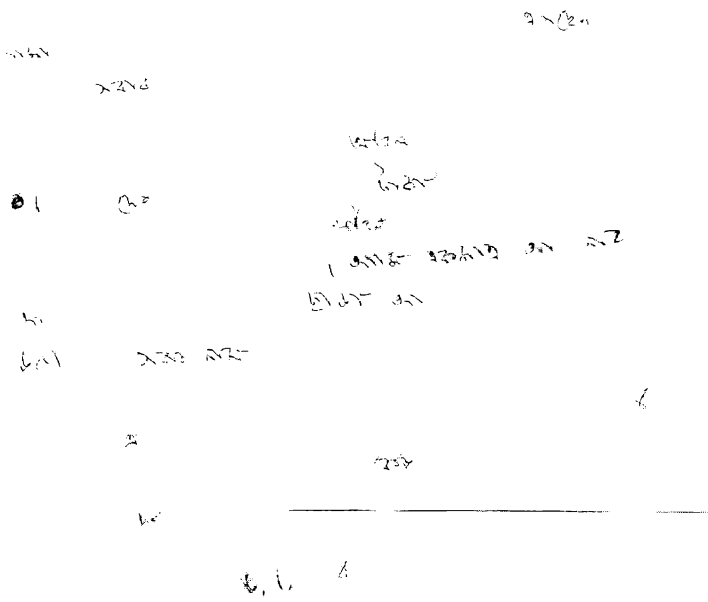

BANGLADESH LIBERATION COUNCIL
বাংলাদেশ বুদ্ধিজীবী সংগ্রাম পরিষদ

কামরুল ভাই,
আমাদের যে সমস্ত Painterরা ওখান থেকে এসেছেন, তাদের সবার নাম-ঠিকানা কি আপনার কাছে আছে?
সবার নাম এবং ঠিকানাগুলো অবিলম্বে দরকার।
Painterদের সবার জন্যে কিছু টাকা-পয়সার আয়োজন হচ্ছে। তাদের সবার সঙ্গে অবিলম্বে আমার একটু যোগাযোগ হওয়া দরকার। আমি একমাত্র আপনার আর মুস্তাফা মনোয়ার ছাড়া আর কারও ঠিকানা জানি না। সবার নাম এবং ঠিকানা হয়তো আপনার কাছে থাকতে পারে, তাই লিখলাম।
আমি দু-এক দিনের মধ্যে আপনার সঙ্গে দেখা করব। কমার্শিয়াল পেইন্টাররাও যদি কেউ এসে থাকে, তাদেরও নাম ঠিকানা দরকার।

জহির রায়হান

চিঠি লেখক : শহীদ জহির রায়হান। চলচ্চিত্রকার ও কথাশিল্পী। ১৯৭২ সালের ৩০ জানুয়ারি মিরপুরে অগ্রজ শহীদুল্লা কায়সারের খোঁজ করতে গিয়ে তিনি নিখোঁজ হন।

চিঠি প্রাপক : পটুয়া কামরুল হাসান। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের বাঘের মতো হিংস্র মুখ এঁকে যুদ্ধের ভয়াবহতা প্রমাণ করেছিলেন।

সংগ্রহ : মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর থেকে।

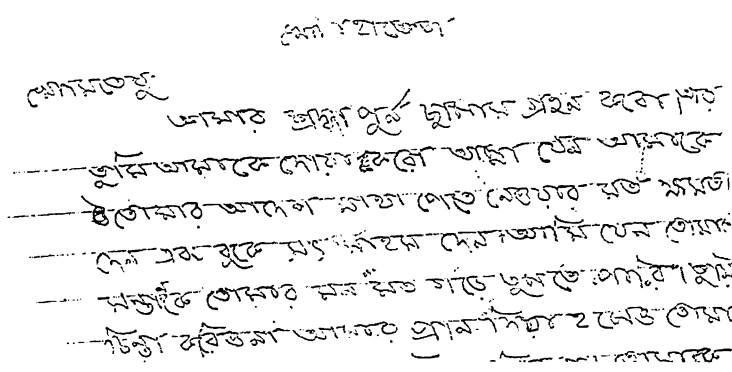

খোদা হাফেজ

খেদমতেষু

আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ ছালাম গ্রহণ করো। আর তুমি আমাকে দোয়া করো আল্লা যেন আমাকে তোমার আদেশ মাথা পেতে নেওয়ার মতো ক্ষমতা দেন এবং বুকে সৎ সাহস দেন। আমি যেন তোমার সন্তানকে তোমার মনমতো গড়ে তুলতে পারি। তুমি চিন্তা করো না। আমার প্রাণ দিয়ে হলেও তোমার সন্তানের অমর্যাদা আমি করব না। তোমাকে আমি খোদার নিকট আমানত রেখেছি। আল্লা যেন আমার স্বামীকে বাঁচিয়ে রাখেন। আমি যেন শুধু জানি আমার স্বামী বেঁচে আছে তা হলে আমি অনেক সান্ত্বনা পাব। আল্লা যা করেন সবই মঙ্গলের জন্য করেন। আল্লা কোন মঙ্গল নিহিত রেখেছেন তিনি জানেন। খোদা, আমি পাপিষ্ঠ তবু তোমার বান্দা, আমার প্রার্থনা তোমাকে শুনতেই হবে। আয় খোদা, আমার স্বামীর আশা আকাঙ্ক্ষা তুমি ধূলিসাৎ করে দিয়ো না। তার জান-ছালামত নিরাপদে রেখো।

তুমি একা যেয়ো না, সঙ্গে লোক নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করো। রাস্তায় খুব সাবধানে চলো। আগে থেকে খোঁজ নিয়ো যদি সম্ভব হয় যেয়ো। আল্লার ওপর ভরসা রেখে খুব সাবধানে পথ চলো। তোমার কথা মোতাবেক টাকা আমি দিয়ে দিলাম। পরিস্থিতি বুঝে খালাম্মারা গেলে আমিও চলে যেতে পারি। আল্লা যদি ছহি-ছালামতে পৌঁছায় তুমি সংবাদ দেওয়ার চেষ্টা করবে। পৌঁছে গেলে আমি তোমার জন্য চিন্তা করব না। তোমার যাওয়ার কথা কারও কাছে কোনোরকম আলাপ-আলোচনা করব না। বিদায় যে কত করুণ কত বেদনাপূর্ণ, বিদায় যে দেয় সেই বোঝে। স্রোত যদি মাঝ নদীতে তরঙ্গ হারায় তার বেদনা সেই বোঝে। আমি, তোমার ছেলে-মেয়েরা ভালোর দিকে। চিন্তা করো না। খোদা তোমার নিকট সঁপে দিলাম। তুমি হেফাজতে রেখো।

ইতি

হতভাগী রেণু

(পুনশ্চ) শ টাকার নোট ৫টি দিলাম। শ টাকার নোট ৫টি ছিল আর ৫০ টাকার নোট ছিল (...)টি।

চিঠি লেখক : শামসুন নাহার (রেণু)। তিনি প্রাপকের স্ত্রী। গ্রাম : ফটিয়ামারী, ইউনিয়ন : রৌহা, শেরপুর সদর, শেরপুর। তাঁর বর্তমান ঠিকানা : গূর্দানারায়ণপুর, শেরপুর, টাউন, শেরপুর।

চিঠি প্রাপক : মুক্তিযোদ্ধা ইমদাদুল হক (হীরা মিয়া)। বর্তমানে মৃত।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : আহমদ আজিজ, আমলাপাড়া, জামালপুর।

'মা' রেখা

আমার আন্তরিক স্নেহ ও ভালোবাসা জানিও। তুমি অনেক দিন পর্যন্ত আমার নিকট কোনো চিঠিপত্র লিখিতেছ না। তোমরা লিখিতেছ, না আমি পাইতেছি না, তাহা জানা যাইতেছে না। লিখিয়া থাকিলে নিশ্চয় পৌঁছাইত। তোমার আম্মাও বোধ হয় ভীষণভাবে রাগ করিয়াছে, তাহা না হইলে কোনো খবর দিতেছে না কেন? জানুর নিকট সে পত্র দিয়াছে, তাহার মানে আমাকে লিখিলে নিশ্চয় পাইতাম। জানুর পত্র মাঝে মাঝে পাইয়া থাকি। তার বড় ছেলের অসুখ বলিয়া আমাকে লিখিয়াছে। পরশু দিন তোমার আম্মাকে এক চিঠি লিখিয়াছি, আশা করি কয়েক দিনের মধ্যে পাইবে। মা রেখা, তুমি কিছু লেখাপড়া শিখিয়াছ, তাহাতে তুমি অনুভব করিতে পারিবে যে স্বাধীনতা আন্দোলনে অনেক কিছু ঘটিয়া থাকে, আর সে আন্দোলনের মুখে আমরাও আসিয়া পড়িয়াছি। তাই বহু রকম বিপদ কাটাইয়া উঠিতে উত্থান-পতনের ঝুঁকি সহিতে হইবেই। তাহাতে আমি একা নই। লক্ষ লক্ষ লোকের ব্যাপার। আশা করি তোমরা ভাঙ্গিয়া পড়িবে না। আমার ছোটমাদিগকে আমার অনুপস্থিতির কথা বুঝিতে দিও না। তাহাদের শারীরিক সুস্থতার প্রতি লক্ষ্য রাখিও এবং স্নেহ-মমতার মাধ্যমে যাহাতে তাহারা দিন যাপন করিতে পারে তাহার প্রতি দৃষ্টি দিয়ো। তোমার আম্মাকে চিন্তা করিতে বারণ করিও। তোমাদের লেখাপড়া রীতিমতো চালাইও। দেশ আগামী কিছুদিনের মধ্যেই মুক্ত হইবে কারণ হাজার হাজার মুক্তিফৌজের আক্রমণে বেশিদিন হানাদার বাহিনী টিকিয়া থাকিতে পারিবে না। ছোট ভালো আছে। সে তোমাদিগকে দেখার জন্য অত্যন্ত উদগ্রীব, সুযোগ পাইলে দেখা করিবে। তোমার আম্মাকে দোয়া করিতে বলিও।

আমার নামাজ-রোজার কোনো অসুবিধা হইতেছে না, সবকিছু পালন করার সুযোগ আছে। খাওয়া-দাওয়ার কিছু অসুবিধা থাকিলেও চলিয়া যাইতেছে। ঈদে তোমাদিগকে দেখা করার ইচ্ছা পোষণ করি। বাকি খোদার মর্জি। (...) তোমাদের সাথে দেখা করিয়াছিল কি না? নওমকে পাঠানোর কথা অবস্থা বুঝিয়া পাঠাইয়া দিয়ো। না পাঠাইলে খুব সতর্কভাবে থাকিতে বলি। শহরে বা বাড়িতে যাইতে নিষেধ করিও। সব কিছুর আশা ছাড়িয়া দিতে বলিও। সময় সুযোগ থাকিলে সবকিছু হইবে বলিয়া আশা রাখি। মানুষের রিজিক আল্লাহর হাতে। আমি শারীরিক ভালোই। তোমার আম্মার শরীরের প্রতি লক্ষ্য রাখিও। তোমাদের সকলের শারীরিক অবস্থা জানাইয়া সুখী করিও। বাড়ির সকলকে আমার সালাম-দোয়া দিও। ছোট 'মা'দিগকে বলিও আমি ভালোই আছি। আমার কাপড় বিশেষ না থাকিলেও শীত কাটানোর মতো ব্যবস্থা কোনোরকমে করিয়া লইতে পারিব। তোমরা যেন কোনো অসুবিধায় না থাক। এখন আর না। সকল মায়ের প্রতি সমান দোয়া রহিল।

ইতি তোমারই

বাবা

চিঠি লেখক : মুক্তিযোদ্ধা আবদুল মালেক (মৃত)

চিঠি প্রাপক : ফেরদৌস আরা বেগম (রেখা)। তিনি চিঠি লেখকের মেয়ে। গ্রাম : মধুপুর, জেলা : ফেনী। বর্তমান ঠিকানা : ন্যাশনাল লাইফ ইনসিওরেন্স কোং লি., ৫৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : ফেরদৌস আরা বেগম (রেখা)।

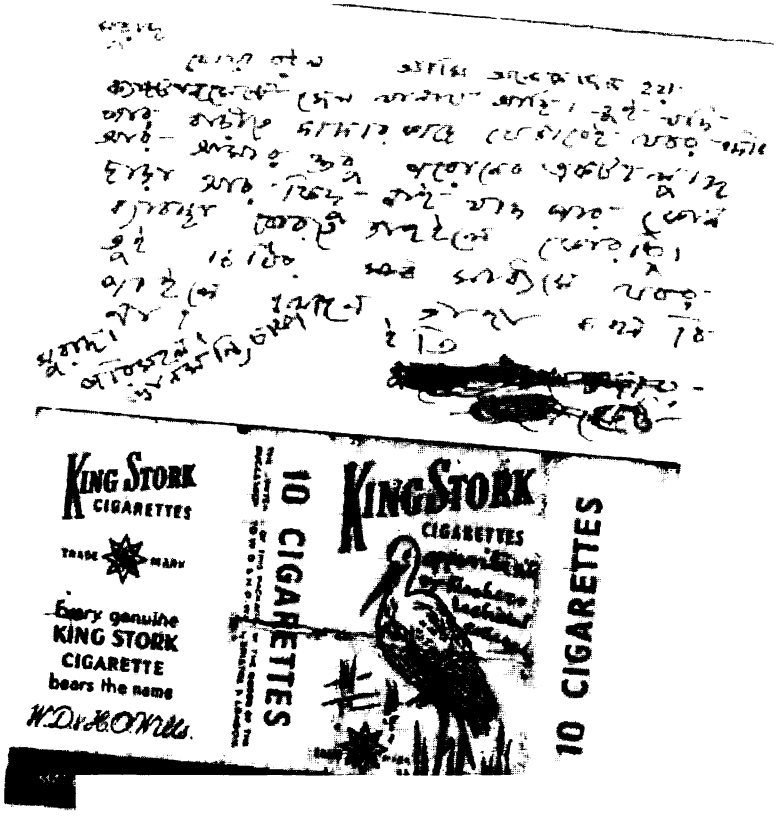

মুরাদ,

দোয়া রইল। আমি অনেক দিন হয় ক্যান্টনমেন্ট জেলখানায় আছি। তুই যদি পারিস বাড়িতে দাদার কাছে যেভাবেই (...) খবর দিবি। আর আমার শুধু পরনের একটা লুঙ্গি ছাড়া আর কিছু নাই, যদি পারিস কোনো ব্যবস্থা করতে তা হলে করবি। তুই চিঠির মাধ্যমে খবর পেলে এখানে তা বলবি না।

ইতি

জালালউদ্দিন সরদার

চিঠি লেখক : মুক্তিযোদ্ধা জালালউদ্দিন সরদার। তিনি মে মাসের শেষ দিকে আটক হন। ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে আটক ছিলেন। অক্টোবরের শেষ দিকে ছাড়া পান।

চিঠি প্রাপক : মুরাদ। পরিমহল, ধানমন্ডি, ঢাকা।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : এ কে এনামুল হক চৌধুরী। ঠিকানা : অ্যাপার্টমেন্ট এ-১, বাড়ি-৫৩, রাস্তা-১, ব্লক-আই, বনানী, ঢাকা।

জালালউদ্দিন সরদার সিগারেট প্যাকেটের অপর পৃষ্ঠায় চিরকুটটি প্রাপকের কাছে পাঠিয়েছিলেন ১৯৭১ সালের জুন মাসের প্রথম দিকে; ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের বন্দিশিবির থেকে ছাড়া পাওয়া অন্য এক লোকের মাধ্যমে।

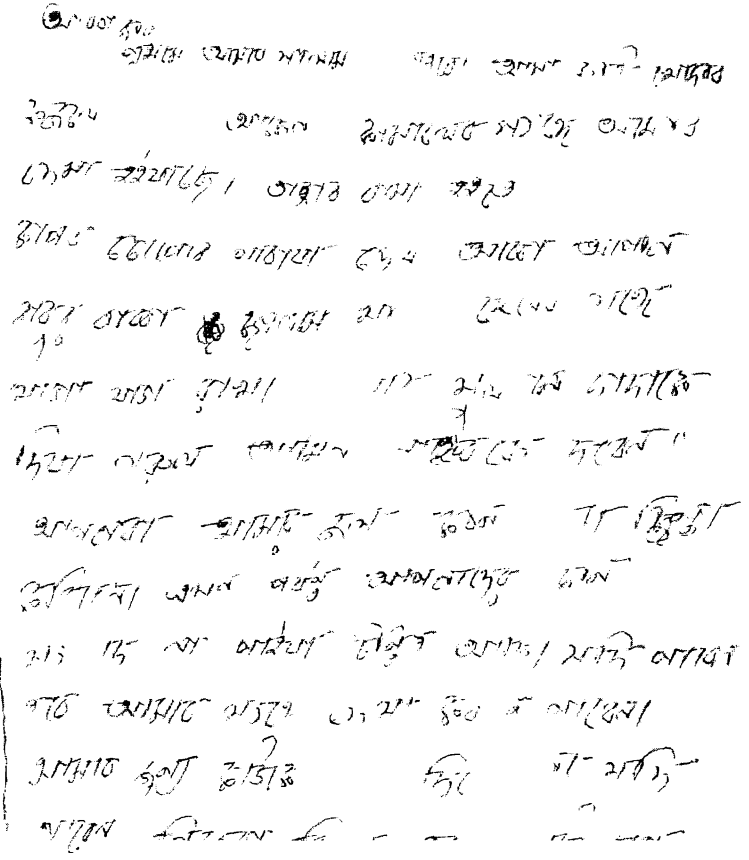

আব্বাজান,

প্রথমে আমার সালাম জানাইব। আশা করি খোদার ফজলে ভালোই আছেন। কামালের সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছে। তাহার বাসা হইতে যেন কাপড়চোপড় পাঠাইয়া দেয়। আব্বা, আপনি বাবুর আব্বা ছালাম খান সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ রাখিবেন। আর সুলতান দাদাকে দিয়া নূরুল আমিন সাহেবকে ধরেন। আপনারা আমার জন্য কোনো রকম চিন্তা করিবেন না। এখন পর্যন্ত আপনাদের কোনো সংবাদ না পাইয়া চিন্তিত আছি। যদি পারেন তবে আমার সঙ্গে দেখা করিতে পারেন। আমার জন্য কাউকে টাকা দিবেন না। যদি পারেন নিজেরা কিনে জেল গেটে জমা দিয়া দিবেন। আপনি আম্মাকে সান্ত্বনা দিয়া রাখিবেন। আম্মাকে আমার সালাম ও দোয়া করিতে বলিবেন। এরশাদ ভাই ও মামাদের আমার সালাম জানাইবেন ও দোয়া করিতে বলিবেন।

ইতি

কবির

চিঠি লেখক : মুক্তিযোদ্ধা কবির। জেল থেকে বাবার কাছে লিখেছেন।

সংগ্রহ : মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর থেকে।

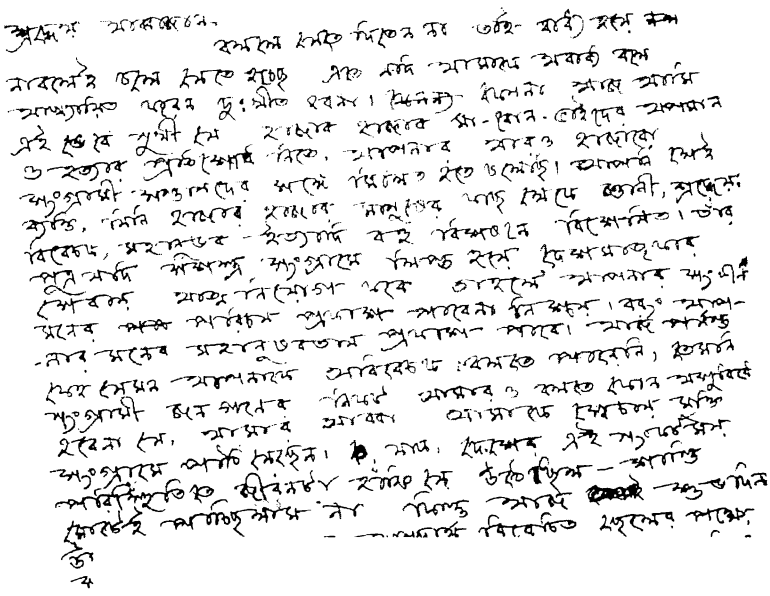

শ্রদ্ধেয় আব্বাজান,

বললে যেতে দিতেন না। তাই বাধ্য হয়ে না বলেই চলে যেতে হচ্ছে। এতে যদি আমাকে অবাধ্য বলে আখ্যায়িত করেন, দুঃখিত হব না। কেননা আজ আমি এই ভেবে সুখী যে হাজার হাজার মা-বোন-ভাইয়ের অপমান ও হত্যার প্রতিশোধ নিতে, আপনার আরও হাজারো সংগ্রামী সন্তানের সঙ্গে মিলিত হতে চলেছি। আপনি সেই ব্যক্তি, যিনি হাজার হাজার মানুষের কাছ থেকে জ্ঞানী, শ্রদ্ধেয়, বিবেচক, মহানুভব ইত্যাদি বহু বিশেষণে বিশেষিত। তাঁর পুত্র যদি সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে দেশমাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করে, তাহলে আপনার সংকীর্ণ মনের পরিচয় প্রকাশ পাবে না নিশ্চয়। বরং আপনার মনের মহানুভবতাই প্রকাশ পাবে। আজ পর্যন্ত কেউ যেমন আপনাকে অবিবেচক বলতে পারেনি, তেমনি সংগ্রামী জনগণের নিকট আমারও বলতে কোনো অসুবিধা হবে না যে আমার আব্বা আমাকে স্বেচ্ছায় মুক্তিসংগ্রামে পাঠিয়েছেন। যাক, দেশের এ সংকটময় পরিস্থিতিতে জীবনটা হাঁপিয়ে উঠেছিল, শান্তি মোটেই পাচ্ছিলাম না। কিন্তু আজ শুভদিন উপস্থিত। আমার মতো অপদার্থ বিবেচিত ছেলের পক্ষে স্বাধীনতার জন্য জীবন দেওয়া সৌভাগ্য ও সুখের নয় কি?

যাক, মা শুনলে হয়তো ধৈর্য হারিয়ে ফেলবেন। কেননা আপনাদের মতো ব্যক্তিত্ব তাঁর নেই। মাকে বুঝিয়ে বলবেন যে আমি তো শুধু একা যাইনি, আরও হাজারো মায়ের হাজারো সন্তান গেছে। তাঁর ভাই-ভাতিজা-বোনের ছেলে—সবাই গেছে। আমার জন্য চিন্তা না করে আমার তথা সমগ্র

মুক্তিযোদ্ধা এবং দেশের স্বাধীনতার জন্য আপনারা দোয়া করবেন। আমার অনুরোধ, আপনার যেন কখনো ধৈর্যচ্যুতি না ঘটে। তা না হলে সব দিক সামলানো আপনার পক্ষে দায় হয়ে পড়বে। আমার অভাব পূরণ করবে শফি ভাই। তা ছাড়া প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে দেখতে পাবেন আমাকে। যাক, আল্লাহর লীলা হয়তো এটাই আমার শেষ বিদায়ও হতে পারে। তাই সাংসারিক কিছু বলতে চাই। পরিবারের কারও ওপর যেন আপনার অবিচার না হয় সেদিকে খেয়াল রাখবেন। সবাইকে আমার অনুরোধ জানিয়ে দেবেন যে তারা যেন প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে মিলেমিশে থাকে, একে অপরকে ভালোবাসতে শেখে, হিংসাত্মক মনোবৃত্তি সবাই যেন বাদ দেয় এবং একে অপরের সম্পর্কে কোনোরকম বিরূপ কথা না বলে। যদি কারও বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করতে হয়, তা যেন আপনার কাছে করে। তাহলেই ঝগড়াঝাটি বন্ধ হবে এবং শান্তি আসবে। জানি না, আমার অনুরোধ কে কতখানি রাখবে। যাক, সকলের মনোভাব পর্যবেক্ষণ করে সেই মোতাবেক কাজ করবেন। আল্লাহ না করুক, আমার বোনগুলোর বিয়ে এবং ছোট ২টি ভাইকে মানুষ হওয়ার ব্যবস্থা যেন থাকে। আর বলতে গেলে একরকম অনাথ শফি ভাইয়ের সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার মতো একটা ব্যবস্থা করবেন। ভাইয়ের প্রতি আমার অগাধ বিশ্বাস আছে যে তিনি কখনো কাউকে তাঁর স্নেহ থেকে বঞ্চিত করবেন না। বড় মা ও ফুফুমার কাছে কোনো অনিচ্ছাকৃত অপরাধ করে থাকলে তাঁরা যেন আমায় ক্ষমা করেন। ওই বড়মার কাছেও একই প্রার্থনা। দরকার হলে আমার সম্পর্কে বাইরে প্রচার করবেন যে নানাকে দেখতে গিয়ে এখনো ফেরেনি। এবং রাগে মুখে চিন্তার অভিনয় ফুটিয়ে তুলবেন। আর অধিক কী? আপনি তথা, প্রত্যেককে আমার সংগ্রামী সালাম জানাবেন। ছোট ভাইবোন ও মোমেনার প্রতি রইল আমার স্নেহ। সম্ভব হলে আমার অবাধ্যতা ক্ষমা করবেন।

ইতি

স্নেহের এ খালেক (সাবু)

চিঠি লেখক : মুক্তিযোদ্ধা এ খালেক (সাবু), যুদ্ধশেষে দেশে ফিরে ১৯৭২ সালের ১৯ জানুয়ারি নিজ গ্রামে নকশালপন্থীদের হাতে তিনি নিহত হন।

চিঠি প্রাপক : পিতা : খবিরউদ্দিন আহমদ। বর্তমানে মৃত। গ্রাম : গোপালপুর; পো : ফেটগ্রাম, থানা : মান্দা; জেলা : নওগাঁ।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : লেখকের ভাই ডা. শহীদুল।

তারিখ :.....'৭১

আবিদ ভাই ও নিম্বু,

সালাম নিবেন ও নিয়ো। কতক্ষণ আগে তোমাদের দুটা চিঠি পেলাম একই সাথে। ২৬ ও ২৭ তারিখে লেখা। কলকাতায় পৌঁছে আমরা একটা চিঠি দিয়েছিলাম ২৪ অথবা ২৬ তারিখের মধ্যে। ঠিক তারিখ মনে পড়ছে না। এই চিঠি পাবার আগেই হয়তো সেটা পেয়ে যাবে।

বিলু ভাইয়েরও একটা চিঠি পেলাম আজকে। তার মধ্যে মা ও বাবার Photostat করা চিঠি পাঠিয়েছে। মা খুলনা থেকে লিখেছে ও বাবা ঢাকা থেকে। তোমাদেরকে আগের চিঠিতে বাবা-মার বাড়ি ছেড়ে থাকার কথা লিখেছি কি না মনে নাই। তাই আবার ভালোভাবে লিখছি।

আমরা ঢাকায় থাকতে গ্রীন রোড ও ধানমন্ডি এলাকায় একটা অপারেশন করেছিলাম। ওখানে মোট ৩২ জন পশ্চিম পাকিস্তানি নিহত ও আহত হয়। তোমরা হয়তো জানো না, এখন ঢাকা শহরে পশ্চিম পাকিস্তানি পাঞ্জাবি পুলিশ টহল দেয়। বাঙালি পুলিশ নাই বললেই চলে। যাও আছে, তাদের কাছে অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া হয় না। অবশ্য আজকাল পাকিস্তানিরা একটা নতুন বাহিনী গঠন করেছে। নাম দিয়েছে রাজাকার। এরা প্রায়ই মুসলিম লিগের লোক। অনেক জায়গায় আবার জোর করে পাকিস্তানিরা বাঙালিদের ঢুকাচ্ছে। এক এক মহল্লায় গিয়ে সেখানকার চেয়ারম্যান অথবা সরদার গোছের লোকদের ভয় দেখিয়ে বলছে যে তোমাদের মহল্লা থেকে এতজন লোক রাজাকার বাহিনীতে না দিলে তোমাদের মহল্লা বা গ্রাম ধ্বংস করে দেব। এই রাজাকারদের হাতে ৩০৩ রাইফেল দেওয়া হয় আর তারা ব্রিজ,

রাস্তা ইত্যাদি পাহারা দেয়, যাতে মুক্তিবাহিনী এগুলো ধ্বংস না করতে পারে। যদি কোনো এলাকার Bridge ইত্যাদি ধ্বংস হয়, তাহলে আশপাশের তিন-চার মাইলের মধ্যে বাড়িঘর সব জ্বালিয়ে দেয়। তাই রাজাকারদের বাধ্য হয়ে এসব পাহারা দিতে হয় এবং মুক্তিবাহিনীর লোকেরা ব্রিজ ধ্বংস করতে গেলে তারা *MB হয় Fight করে, না হয়তো হাতে-পায়ে ধরে তাদের ব্রিজ উড়াতে মানা করে। অবশ্য রাজাকাররা অনেক জায়গায় আমাদের সাহায্য করেছে আবার অনেক জায়গায় গ্রামবাসীর ওপর খুব অত্যাচার করেছে। অবশ্য রাজাকাররা আমাদের খুবই ভয় করে (They are no match for us) এবং প্রায় অনেক রাজাকার Defect করে MBতে যোগ দিচ্ছে। যা হোক, গ্রীন রোডে আমরা যে ৩২ জন মেরেছি, তাদের মধ্যে ১২ জন পশ্চিম পাকিস্তানি পুলিশ ছিল আর বাকি সব পাকিস্তানি আর্মি। এইটাই ঢাকা শহরের মধ্যে সবচেয়ে বড় অপারেশন হয়েছিল আর পাকিস্তানিদের heaviest casualty এখানেই হয়। এরপর আর্মি Intelligence তন্ন তন্ন করে ঢাকা শহর খুঁজে বেড়ায়। আমাদের গ্রুপের দুজন ছেলে ধরা পড়ে এবং অনেক বাসা রেইড হয়ে যায়। আমরা ধারণা করছি, ওই ছেলেগুলোকে Torture করে অন্য ছেলেদের খবর পেয়েছে। যা-ই হোক, অন্যান্য পাঁচ-ছয়টা ছেলের বাড়ি রেইড হয়ে যায়, যদিও ছেলেগুলো কেউই বাড়িতে ছিল না। তাদের না পেয়ে তাদের বাবাদের ধরে নিয়ে যায় এবং বাড়ির অন্যদের অত্যাচার করে। আমি তখন বাসায় গিয়েছিলাম কয়েক দিন আরাম করব মনে করে। কিন্তু এ খবর পেয়েই ঢাকা শহর ত্যাগ করে আশপাশের গ্রামাঞ্চলে ছিলাম। দু-এক দিন করিম ভাইয়ের বাড়িতে গিয়েছিলাম এবং বলে দিয়েছি বাসা ছেড়ে অন্য কোথাও থাকতে।

টিটো

*MB—মুক্তিবাহিনী।

চিঠি লিখেছেন : মুক্তিযোদ্ধা টিটো।

চিঠি প্রাপক : আবিদ ভাই ও নিম্মু।

সংগ্রহ : মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর থেকে।

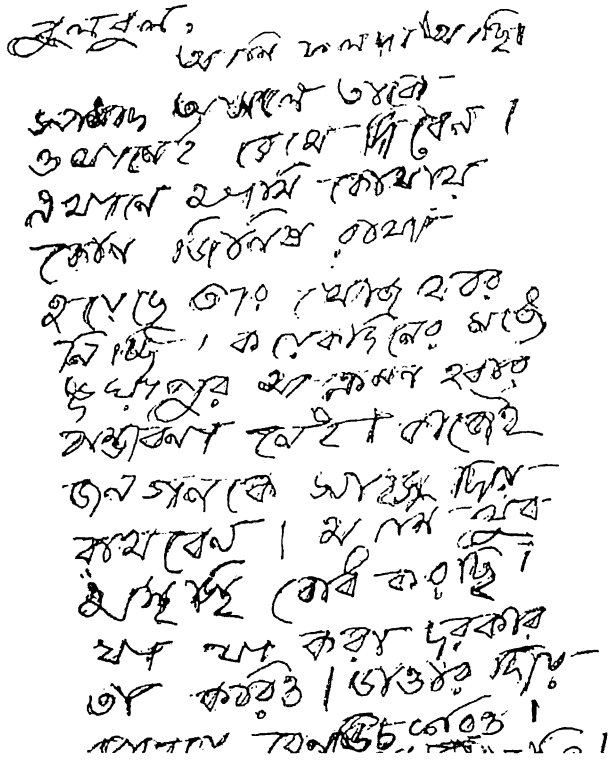

বুলবুল,
আমি ফলদা আছি। সামাদ এলে তাকে ওখানেই রেখে দিবেন। এখানে আমি কোথায় কোন জিনিস রাখা হয়েছে তার খোঁজখবর নিচ্ছি। কয়েক দিনের মধ্যে ভুয়াপুর আক্রমণ হবার সম্ভাবনা নেই। কাজেই জনগণকে সাহস দিয়ে রাখবেন। আমি খুব অস্বস্তি বোধ করছি। যা যা করা দরকার তা করিও। ডাক্তার দিয়ে পায়ে বেনডিচ (ব্যান্ডেজ) করিও। লতিফকে এখানে পাঠিয়ে দিও।
ইতি
এনায়েত করিম

চিঠি লেখক : এনায়েত করিম। তিনি কাদেরিয়া বাহিনীর পশ্চিমাঞ্চলীয় হেডকোয়ার্টার, ভুয়াপুরের প্রশাসনিক প্রধান ছিলেন।

চিঠি প্রাপক : বুলবুল খান মাহবুব। তিনি ছিলেন কাদেরিয়া বাহিনীর উপদেষ্টামণ্ডলীর অন্যতম সদস্য, টাঙ্গাইল।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : আব্দুস ছাত্তার খান (বাবু)। গ্রাম ও ডাকঘর অর্জুনা, উপজেলা : ভুয়াপুর, জেলা : টাঙ্গাইল।

ডিয়ার স্যার
সালাম জানবেন। আমার শরীর খুউব খারাপ, তাই আপনার সাথে দেখা করতে পারলাম না। মুন্সিরহাট রেকি করতে গিয়ে সমস্ত শরীরে দাগ হয়ে গেছে। থাক আজ। মুন্সিরহাট হাইস্কুল, স্টেশন ও কমান্ড সেন্টার-এর জন্য অ্যান্টি ফায়ার দিন। ওখানে দুই শত পাক আর্মি আছে। বাদবাকি আমার বাহকের কাছে শুনুন।
তারালিয়া মুন্সিবাড়িতে ৬২ জন পাকফৌজ আছে।
দুইটি মেশিনগান, ৮টি এলএমজি ও একটি কেন্ডার সেট ও একটি ২´´ মর্টারসহ ছোট হাতিয়ার আছে। জোলাইতে ৩২ জন পাক আর্মি ও ৮ জন রাজাকার আছে। দুইটি মেশিনগান ও ৬টি এলএমজি ও একটি ২´´ মর্টার আছে। মাই রিপোর্ট ইজ হান্ড্রেড পার্সেন্ট সিওর।
ইতি
সালেহ আহমেদ
ইন্টেলিজেন্স মুক্তিফৌজ, টাঙ্গাইল

মুক্তিযোদ্ধা সালেহ আহমেদ পাকিস্তানি বাহিনীর অবস্থান রেকি করে তাঁর কমান্ডারকে এই গোপন চিঠিটি লেখেন। চিঠিটি *প্রথম আলোর* ২০০৫ সালের ২২ মার্চ স্বাধীনতা দিবস বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।
সংগ্রহ : মেজর (অব.) রফিকুল ইসলাম, পিএসসি-র কাছ থেকে।

আম্মা,

অনেক দিন পর আপনার ও লুৎফার চিঠি পেলাম। গত পহেলা তারিখে ঈশ্বরগঞ্জ থেকে আব্বার প্রথম চিঠি পাই ও সবার কথা জানতে পারি। এই অবস্থায় আপনারা সবাই ভালো আছেন জেনে অনেক নিশ্চিন্ত হয়েছি। গ্রামে যা আছে তা নিয়েই আপনাদের বাঁচতে হবে। আশা করি সে মতোই আপনারা ভেবে চলবেন। কবে পর্যন্ত যে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে বলা যায় না। আজকাল অবশ্য আপনাদের বিশেষ কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নেই। মাছ পাওয়া যায়। ধান পাকতে শুরু হয়েছে। আজকাল গ্রামে অনেকে এসেছে। ছোটদের পড়াশোনা কবে শুরু হবে লিখেছেন। গ্রামে এখন এত শিক্ষিত লোক। আপনার এক বৌ ইউনিভার্সিটি পড়া, স্কুল-কলেজ বাড়িতে শুরু করে দেন। খাওয়া-দাওয়া ও পানির প্রতি খেয়াল রাখবেন। আজকাল তো আবার ডাক্তার-ওষুধ পাওয়া মুস্কিল হবে।

সৌদি আরব থেকে ভাইজানের চিঠি পেয়েছি, লন্ডন থেকে রফির চিঠি পাই, শেলী ইসলাম ও দিবা ভালো। ইসলামাবাদে ভাইজানের কাছে প্রতি সপ্তাহে যাই। ভাইজান ভালো আছেন। শেরপুর থেকে ভাবীর চিঠি পেয়েছেন। ভালো আছেন।

আব্বা কেমন আছেন? আমাদের জন্য আপনারা ভাববেন না। ভেবে কী লাভ হবে। যখনই সম্ভব হবে আমি আপনাদের কাছে পৌঁছব। খোকা, মনু, বাহার, বেলাল, ডলি-জলিকে লিখতে বলবেন। আপনারা সাহস হারাবেন না।

আব্বা ও আপনি আমার সালাম নেবেন। নীলু কেমন আছে? ওকে লিখতে বলবেন।

ইতি,
আপনার স্নেহের
তাহের

চিঠি লেখক : কর্নেল আবু তাহের। চিঠিতে তারিখ উল্লেখ নেই। জুলাই ১৯৭১-এ তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে বাংলাদেশে এসে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন এবং ১১ নং সেক্টরে যুদ্ধ পরিচালনা করেন।

চিঠি প্রাপক : মা আশরাফুন্নেসা।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : লুৎফা তাহের।

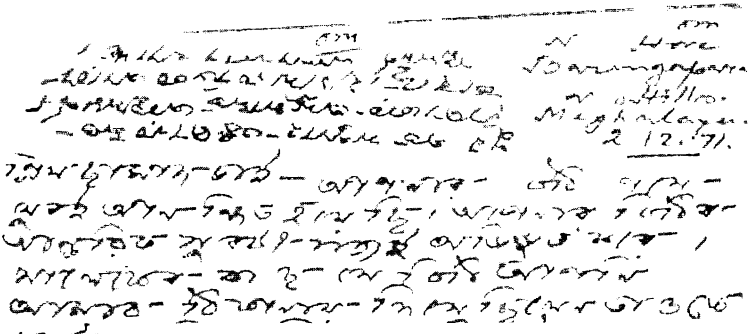

প্রিয় ছামাদ ভাই

আপনার চিঠি পেয়ে খুবই আনন্দিত হয়েছি। আপনার চিঠির আন্তরিক সুরটি সত্যিই অভিভূত করে। মালেকের কাছে যে চিঠি আপনি আমার ঠিকানায় দিয়েছিলেন তা ওকে পৌঁছে দিয়েছি সেই দিনই। ও এখনো বারাসাপাড়ায় আছে। গতকাল আনিস সাহেব ওর জন্য একটা তুলার কম্বল আমার কাছে রেখে গিয়েছিলেন। তা ওকে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। তবে শীতের প্রকোপের তুলনায় তুলার কম্বল কিছুই নয়। আর ওর শরীরে যে কোনো শীতবস্ত্রও আমার নজরে পড়ে না। সুতরাং ও অসুবিধায় আছে বলে আমার বিশ্বাস।

মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা খুব বেশি। নয়াবিল পর্যন্ত এখনো মুক্তাঞ্চল। গত ৩০ তারিখ বিবিহপাড়া থেকে মুক্তিযোদ্ধারা এক অপারেশনে ঝিনাইগাতি বাজারে যায় এবং ১৩ জন রাজাকারকে অস্ত্রসমেত বন্দী করে নিয়ে আসে এবং রাজাকারদের আস্তানায় আটক চারজন মুক্তিযোদ্ধাকে মুক্ত করে নিয়ে আসে। সত্যিকারভাবে অপারেশনটা খুবই দুঃসাহসিক অপারেশন ছিল। রাজাকারদের দৌরাত্ম্য বাওরামারি অঞ্চলের বুরুঙ্গা গ্রামের সব লোক চলে এসেছে। এবং এখনো আসছে। নালিতাবাড়ীতেও তৎপরতা শুরু হয়েছে। সুতরাং অবস্থা বেশ গরম বলা যায়। আশা করা যায়, হয়তো বাংলাদেশ আর সুদূরের সম্ভাবনা নয়। হবিবর স্যারের কোনো খবর পাচ্ছি না। অবশ্য উনার খবর জোগাড়ের জন্য আমি চেষ্টা করছি। খবর পেলে জানাব। রোহিনা স্যারকে আপনার আদাপ জানিয়েছি।

জলপাইগুড়ি এখনো যাইনি। তবে যাওয়ার আশা করছি। দেখা যাক কী করা যায়।

আপনি আমার আদাপ নেবেন। ভাবী কোথায়? আপনার কাছে সবার আমার আদাপ দেবেন।

আর কী লিখব? আপনার কুশল কামনা করি।

জয় বাংলা

ইতি

নিতাই হোড়

চিঠি প্রাপক : অ্যাডভোকেট এম এ সামাদ, তিনি ২০০৭ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

চিঠি লেখক : মুক্তিযোদ্ধা নিতাইলাল হোড়। তিনি বর্তমানে শেরপুর বারে সিনিয়র আইনজীবী। বটতলা, শেরপুর টাউন, শেরপুর।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : প্রাপকের ছেলে জয়েনউদ্দিন মাহমুদ।

'এত গৌরবময়, এত বেদনাময় বছর বাঙালির জীবনে আগে কখনো আসেনি। বছরটি ১৯৭১। এই একটি বছরের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্ব বাংলাদেশকে জানল, চিনল এবং বুঝতে পারল সবুজ শ্যামল প্রকৃতির কাদামাটির মতো নরম বাঙালি প্রয়োজনে কতটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে। কোনো সন্দেহ নেই, বাঙালি বর্ষাকালে যেমন কোমল, গ্রীষ্মে তেমনই রুক্ষ ও কঠিন। কে ভাবতে পেরেছিল, 'ভেতো বাঙালি' নামে অভিহিত, 'কাপুরুষ' পরিচয়ে পরিচিত বাঙালি জাতি পাকিস্তান নামের অবাস্তব একটি রাষ্ট্রের জন্মের ছয় মাস যেতে না যেতেই আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠায়, মাতৃভাষার অধিকার অর্জনে সোচ্চার হয়ে উঠবে? পৃথিবীতে এমন দৃষ্টান্ত বিরল যে শুধু ভাষার জন্য সংগ্রাম করে, স্বাধীনতা অর্জনের বীজটি বপন করে, ২৩ বছর অতিক্রান্ত হতে না হতেই একটি প্রদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল। এর জন্য সেই প্রদেশের অধিবাসীদের সশস্ত্র যুদ্ধ করতে হয়েছে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে; এবং অবিশ্বাস্য সত্য হচ্ছে, 'ভীরু, অলস, কর্মবিমুখ, কাপুরুষ, ভেতো, যুদ্ধবিদ্যায় অনভিজ্ঞ' এই বাঙালিই মাত্র নয় মাসে স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছে। স্বাধীনতার জন্য প্রাণের আবেগ যখন দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে, তখন পৃথিবীর যত ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্রই ব্যবহার করা হোক না কেন, সেই আবেগের কাছে তা তুচ্ছ হয়ে যায়। তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি আমেরিকা-ভিয়েতনামের যুদ্ধে। বিশ্ববাসী সেই প্রমাণ পুনরায় প্রত্যক্ষ করেছে ১৯৭১ সালে, বাঙালির মুক্তিযুদ্ধে।'

মুক্তিযুদ্ধকালে লিখিত চিঠিগুলো শুধু লেখক-প্রাপকের সম্পর্কে সীমাবদ্ধ নয়; যেন রক্ত দিয়ে রচিত এই কথামালা যেমন সবার সম্পদে পরিণত হয়, তেমনি পরিগণিত হবে ইতিহাসের এক অনন্য সম্পদরূপে।

ISBN 978-984 8765 00 5

9 789848 765005